Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম

রোলঃ 23090120660


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম

রোলঃ 23090120660

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে কুলসুম, আইডিঃ 23090120660 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Umme Kulsum

(স্বাক্ষর)

**উম্মে কুলসুম**

আইডিঃ 23090120660
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... 5

বিষয় নির্বাচনের কারণ ..... 6

সাহিত্যধর্মী সূচনা .....10

থিসিসের / গবেষণার উদ্দেশ্য ..... 10

গবেষণা / থিসিসের প্রশ্নসমূহ ..... 16

থিসিসের গুরুত্ব ..... 22

সাহিত্য পর্যালোচনা ..... 29

সমাজতাত্ত্বিক ও নৈতিক দিক থেকে ঈমানের গুরুত্ব ..... 54

ঈমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ..... 57

ঈমানের মৌলিক শর্তসমূহ ..... 79

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক ..... 92

ঈমান ভঙ্গের কারণ ..... 97

সমাজে ঈমান ভঙ্গের প্রভাব ..... 105

নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ঈমান ..... 108

ঈমানের দৃঢ়তার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ..... 110

ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঈমান রক্ষা ..... 115

নবীজীর (সাঃ) দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের চর্চা ..... 124

ইসলামী ইতিহাসে ঈমান রক্ষা ও পতনের উদাহরণ ..... 127

সচ্চরিত্র সাহাবীদের উদাহরণ ..... 134

ব্যক্তি জীবনে ঈমানের প্রভাব ..... 139

যুগোপযোগী উদাহরণ ও বাস্তব জীবনের প্রমাণ ..... 141

ঈমান দৃঢ় রাখার উপায় ও করণীয় ..... 143

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষন.....146

উপসংহার ..... 148

# ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

## ১।ভূমিকা

ইমানের আভিধানিক অর্থ: 'বিশ্বাস', 'আস্থা', 'স্বীকৃতি' বা 'মেনে নেওয়া'।
ইসলামী পরিভাষায় ইমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে বোঝায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِا للّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ؕ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ؕ وَقَا لُوْا سَمِعْنَا وَاَ طَعْنَا غُفْرَا نَكَ رَبَّنَا وَاِ لَيْكَ الْمَصِيْرُ ؕ

(সুরা বাকার আয়াত:২৮৫)

"রসূল (সাঃ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'।

ইমান হলো আকিদার বিষয়সমূহ জেনে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং কর্মে তা বাস্তবায়ন করা।

ইমান ব্যতীত কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়না।
সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ইমান।
ইমান মুসলমানের কাছে প্রানের চেয়েও প্রিয়।

মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সেই সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায় হলো ঈমান বা বিশ্বাস। ঈমান হলো ইসলামী জীবনের মূলভিত্তি—যা ছাড়া কোনো ইবাদত, নৈতিকতা বা সমাজব্যবস্থা অর্থপূর্ণ হয় না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার সূচনা ঈমান থেকে এবং সমাপ্তি ঈমানেই।

মানবজীবনের আসল সৌন্দর্য ও শান্তি নিহিত রয়েছে সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান-এর মধ্যে। ঈমান ছাড়া মানবজীবনের কোনো লক্ষ্য থাকে না, থাকে না নৈতিকতার ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্যে—তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর সেই ইবাদত তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা দৃঢ় ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বস্তুবাদে নিমগ্ন হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ ও মিডিয়ার প্রভাবে মুসলমানদের ঈমান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।
তার সাথে ধর্মীয় চেতনা  দুর্বল হচ্ছে। অনেক মুসলমানই নামমাত্র মুসলমান হয়ে পড়েছে, কিন্তু ঈমানের আসল অর্থ, তার দাবি ও শর্তাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। এর ফলে সমাজে দেখা দিচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়, বিভ্রান্তি ও আত্মিক শূন্যতা।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ঈমানের প্রকৃত রূপ, তার শর্তসমূহ এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ গবেষণা মূলত সেই প্রয়াসেরই অংশ।

## ২।বিষয় নির্বাচনের কারণ:

এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য হলো— আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল।

মানবজীবনের মূল ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো আমল, কোনো ইবাদতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো— আজকের যুগে অনেক মুসলমান নামধারী হলেও তারা ঈমানের প্রকৃত অর্থ, শর্তাবলি ও তা ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। ফলে অজান্তেই অনেক সময় মানুষ এমন কাজ করে ফেলে যা তার ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। এই ভয়াবহ বাস্তবতা থেকেই “ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ” বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

আরও একটি কারণ হলো— বর্তমান সময়ের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাজে বিভিন্ন মতবাদ, দর্শন ও জীবনদর্শনের প্রভাবে মুসলমানদের বিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে। অনেকেই ঈমানকে কেবল মুখের স্বীকারোক্তি বা পারিবারিক ঐতিহ্য মনে করে, অথচ এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাস,

হৃদয়ের দৃঢ়তা ও কর্মে প্রতিফলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে না। এই অবস্থায় ঈমানের প্রকৃত ধারণা মানুষকে জানানো ও তা দৃঢ় করার প্রয়াসই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

এছাড়া, কুরআন ও হাদীসে ঈমানের গুরুত্ব বারবার বর্ণিত হয়েছে।

( রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার ঈমান নেই, তার কোনো আমলই কবুল হবে না।")

মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ঈমান। এটি এমন এক আলোকিত শক্তি, যা মানুষকে স্রষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত করে, অন্ধকারে পথ দেখায় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজ অনেকেই ঈমানের প্রকৃত অর্থ, এর শর্ত ও সীমারেখা সম্পর্কে বিভ্রান্ত। অনেকে ঈমানকে কেবল মুখের উচ্চারণ বা পারিবারিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে মনে করে, অথচ এটি আসলে হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তরের নূর এবং কর্মে প্রতিফলিত জীবন্ত বাস্তবতা। এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করাই এই বিষয় নির্বাচনের মূল প্রেরণা।

বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনার জাগরণ যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের ছায়াও। নানা মতবাদ, দর্শন, নাস্তিকতা ও আধুনিকতার নামে ঈমানের শিকড় কেটে ফেলার প্রবণতা বাড়ছে। তাই সময় এসেছে ঈমানের প্রকৃত রূপকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, যাতে মুসলমানরা নিজেদের বিশ্বাসের মূলভিত্তি চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে।

তাই ঈমানের স্বরূপ ও এর শর্তাবলি জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করলে আমি মনে করি আমার নিজের ঈমান মজবুত হবে, পাশাপাশি সমাজে ঈমানের সঠিক ধারণা প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হবে

যুক্তিনির্ভর কারণ

১. ঈমান মানবজীবনের মূল ভিত্তি:
ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষের সবকিছুর শুরু ও শেষ ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানই নির্ধারণ করে মানুষ আল্লাহর প্রিয় না অপছন্দনীয়, মুক্ত না অভিশপ্ত হবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۭ

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তারা সৃষ্টির উত্তম।"

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ঈমান ছাড়া কোনো কর্মই আল্লাহর নিকট মূল্যবান নয়। তাই ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরি।

২. সমসাময়িক বিভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস:

বর্তমান যুগে ধর্মীয় বিকৃতি, কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা, এবং সামাজিক মাধ্যমের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মানুষের ঈমানকে নড়বড়ে করে তুলেছে। অনেকেই ঈমান ভঙ্গকারী কাজকে তুচ্ছ মনে করছে, কেউ কেউ আবার "আধুনিকতা"র অজুহাতে ঈমানকে গৌণ করে ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি বিষয়টি নির্বাচন করেছি যেন গবেষণার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে কোন কাজ, কথা বা বিশ্বাস ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

## ৩.ঈমানভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রেরণা:

একজন ব্যক্তি যখন তার ঈমানের প্রকৃত অর্থ বুঝে নেয়, তখন তার চরিত্র, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ফলে সমাজে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সামাজিক তাৎপর্যও বিষয়টি নির্বাচনের অন্যতম যৌক্তিক কারণ।

## ৪. বাস্তব ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

আজ আমরা এমন এক সময়ে আছি, যখন মুসলমানদের পরিচয় সংকটে পড়েছে। অনেকেই ধর্মীয় নাম বহন করলেও ঈমানের মর্মবস্তু হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে, তরুণ সমাজের একাংশ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ তারা ঈমানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক তাৎপর্য বুঝতে পারছে না।

এই গবেষণার মাধ্যমে ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ভঙ্গের কারণগুলো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা গেলে তরুণ প্রজন্মের মনে ঈমানের গুরুত্ব জাগ্রত হবে, এবং তারা আল্লাহভীরু, নৈতিক ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে— যা ইসলামের মূল লক্ষ্য।

## ৫.সমাজ ও পরিবারের উপর ঈমানের প্রভাব

ঈমান শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব স্তরে প্রভাব ফেলে। পরিবারে যদি পিতা-মাতা ঈমানদার হয়, সন্তানরাও সৎ পথে চলে। কিন্তু পরিবারের ভিতরে যদি ঈমান দুর্বল হয়, সেখানে মিথ্যা, প্রতারণা, লোভ ও অন্যায় বেড়ে যায়।

একটি সমাজ তখনই নৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়, যখন তার নাগরিকরা ঈমান ও তাকওয়ায় দৃঢ় থাকে। বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, পরকীয়তা ও সহিংসতার মূলে ঈমানের অভাবই অন্যতম কারণ। তাই সমাজের নৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠনের জন্য ঈমানের স্বরূপ ও শর্ত সম্পর্কে গভীর গবেষণা জরুরি।

## ৬.ইমন ভঙ্গের কারণসমূহ অনুধাবনের প্রয়োজন

অনেক মুসলমানই জানেন না কোন আচরণ বা কথা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে এমন কিছু বলে বা করে যা ঈমানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— কুরআনের আয়াত নিয়ে ঠাট্টা করা, আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা, বা ইসলামী মূল্যবোধের অবমাননা করা।

এই গবেষণায় ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে মানুষ এসব বিষয়ে সচেতন হতে পারে। কারণ, ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত সৎকর্ম অর্থহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন

" কেউ ঈমান অমান্য করলে, তার কার্যাদি নিষ্ফল হবে। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
(সুরা মায়িদা আয়াত-৫)

আবেগময় কারণ

১. ঈমানের আলো হারানো মানুষের বেদনা:
আজকের পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান আছে, প্রযুক্তি আছে, কিন্তু অন্তরে শান্তি নেই। কারণ সেই অন্তরের নূর— ঈমান— ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছে। মানুষ নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। এই বাস্তবতাই হৃদয় স্পর্শ করে, এবং আমি মনে করেছি— মানুষকে ঈমানের সত্যিকার স্বাদ ও গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

২. নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধি:

একজন গবেষক হিসেবে আমি উপলব্ধি করেছি, ঈমান শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় নয়; এটি জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক ও আচরণের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ঈমান দৃঢ় হলে মানুষ বিপদের সময়ও অবিচল থাকে, কিন্তু ঈমান দুর্বল হলে সামান্য পরীক্ষায়ও সে হার মানে। তাই নিজের ও সমাজের আত্মিক জাগরণের লক্ষ্যে এই বিষয়টি হৃদয়ের টান থেকে বেছে নিয়েছি।

৩. পরকালীন মুক্তির চিন্তা:

মৃত্যুর পর মানুষের জন্য একমাত্র আশ্রয় হলো ঈমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

এই হাদীসের আলোকে ঈমানের গুরুত্ব অসীম। মানুষ যাতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঈমান রক্ষা করতে পারে— সেই সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তাই এই বিষয়টি গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া  যাতে ঈমান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে উপলব্ধি করা যায়।

সবশেষে বলা যায়, বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অনীহা ও বিভ্রান্তির সময়েও ঈমানই হতে পারে মানুষের অন্তরের শান্তি, জীবনের দিশা ও পরকালীন মুক্তির চাবিকাঠি। সেই উপলব্ধি থেকেই এ বিষয়টিকে আমি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি — যাতে মানুষ আবারও ঈমানের প্রকৃত অর্থ বুঝে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ফিরে আসে।

## ৪.সাহিত্যধর্মী সূচনা

সাহিত্য মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, চিন্তার গভীরতা বাড়ায়, এবং আত্মাকে শুদ্ধ করে। ঈমানের আলোচনা যখন সাহিত্যধর্মী রূপে উপস্থাপিত হয়, তখন তা কেবল ধর্মীয় আদেশ নয়—একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বানে পরিণত হয়।
ঈমান এমন এক শক্তি যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, তাকে ন্যায়, সত্য ও সৌন্দর্যের পথে পরিচালিত করে।

ইসলামি সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক রচনায় ঈমানকে কখনো আলো, কখনো জীবন, কখনো চিরন্তন সৌন্দর্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানবজীবন এক অবিরাম যাত্রা—
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই যাত্রায় মানুষকে বারবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সঠিক আর ভুলের মাঝখানে পথ বেছে নিতে হয়।
কিন্তু সেই পথনির্দেশনা কে দেয়?
যে আলো অন্ধকারে দিশা দেখায়, যে শক্তি দুর্বলতায় সাহস জোগায়, যে বিশ্বাস ভয়ের বদলে শান্তি আনে
সেই শক্তির নাম ঈমান।

ঈমান হলো এমন এক আধ্যাত্মিক শিখা, যা নিভে গেলে মানুষ জীবনের সব অর্থ হারায়।
যেমন দেহ আত্মা ছাড়া মৃত, তেমনি মানুষ ঈমান ছাড়া দিকহারা।
ঈমান মানুষকে শেখায় কেন বাঁচতে হয়, কাকে ভালোবাসতে হয়, কার কাছে হিসাব দিতে হয়, আর কেমনভাবে জীবনকে মূল্যবান করতে হয়।

## ৫।থিসিসের / গবেষণার উদ্দেশ্য

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানুষের চিন্তা, নীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
এই মহান ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো — ঈমান ।
ঈমান এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তি যা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম করে এবং তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:১২২)

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন —

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَا لُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

"তারা হল সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের যাবতীয় ‘আমাল নিস্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামাতের দিন আমি তাদের (কাজের) জন্য কোন ওজন কায়িম করব না (অর্থাৎ তাদের এ সব ‘আমাল ওজনযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে না)।"

(সূরা আল-কাহফ, ১৮:১০৫)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এবং তার নিদর্শন এর প্রতি বিশ্বাস করবেনা বা ইমান আনবেনা তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।
অতএব, ঈমান হলো ইসলামী জীবনের প্রথম ও প্রধান শর্ত। ঈমান ছাড়া নামাজ, রোজা, হজ বা যাকাতের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষের মধ্যে ঈমানের সঠিক ধারণা, এর শর্তাবলি ও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ নিয়ে বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১. ঈমানের সঠিক ধারণা ও বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন

গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য হলো— ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা ও ধারণা নির্ধারণ করা।
আরবি ভাষায় “ঈমান” শব্দটি এসেছে “আ-মানা” মূলধাতু থেকে, যার অর্থ “নিরাপত্তা প্রদান, বিশ্বাস স্থাপন”। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ঈমানের অর্থ শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়; বরং তা হলো— “আন্তরিক বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি ও কর্মে বাস্তবায়ন।”

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন,

> “ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকার করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালন করা।”
(আল-‘আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ২৩)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য থাকবে— ঈমানের এই তিন দিক (বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম) বিশ্লেষণ করে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো উপস্থাপন করা। বিশেষ করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ঈমানের বাস্তব প্রয়োগকে তুলে ধরা।

২. ঈমানের মৌলিক শর্ত ও উপাদান নির্ধারণ

ঈমান পূর্ণতার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান অপরিহার্য। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস, নবীগণের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস — এই ছয়টি রুকন (ركن الإيمان) ইসলামের মূল ভিত্তি।

নবী করিম ﷺ বলেছেন —

> “ঈমান হলো— তুমি বিশ্বাস করো আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবে, তাঁর রাসুলগণে, আখিরাতে, এবং তাকদীরে — ভালো-মন্দ যা-ই আসুক তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো— এই ছয়টি রুকনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা, এবং আধুনিক চিন্তায় এগুলোর চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি “জ্ঞান ও নৈতিকতা” কীভাবে ঈমানের শর্ত পূরণে সহায়ক, তা তুলে ধরা।

৩. ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ঈমান ও আমল একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতি বা তত্ত্বগত বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। নবীজী ﷺ বলেছেন,

“ঈমান হলো সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট; সর্বোচ্চ শাখা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টকর বস্তু অপসারণ করা।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৩৫)

অর্থাৎ, ঈমান কর্মে প্রকাশ পায়।
এই গবেষণায় উদ্দেশ্য থাকবে— আমল ও ঈমানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা যে, আমলহীন বিশ্বাস কখনো সম্পূর্ণ ঈমান নয়। ইসলামী পণ্ডিত যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন—

> “যে ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করে, তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”
(আল-উম্ম, খণ্ড ১, পৃ. ১৪০)

৪. ঈমান ভঙ্গের কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ

গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো— ঈমান ভঙ্গ বা দুর্বল হওয়ার কারণসমূহ নির্ধারণ করা।
ইতিহাস ও কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে এমন কারণ হলো:

শিরক (আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করা)

কুফরি (অবিশ্বাস বা সত্য অস্বীকার করা)

নিফাক (মুনাফিকি)

রিয়া (দেখানোর জন্য কাজ করা)

জ্ঞানহীনতা ও অহংকার

দুনিয়াবাদ ও ভোগবাদ

গবেষণার উদ্দেশ্য থাকবে— কুরআন-হাদীসের আলোকে এই কারণগুলো শ্রেণিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা, এবং আধুনিক সমাজে এগুলোর রূপ যেমন— ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, বা ভোগবাদী চিন্তা— সেগুলোর প্রভাব চিহ্নিত করা।

৫. সমাজে ঈমানের ভূমিকা ও প্রভাব বিশ্লেষণ

ঈমান কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি সমাজব্যবস্থারও মেরুদণ্ড। যে সমাজে ঈমান দৃঢ়, সেখানে ন্যায়, শান্তি ও পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।
আল্লাহ বলেন —

> “যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকত খুলে দিতাম।”
(সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:৯৬)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো— সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঈমানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা, এবং নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি ও অপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে ঈমান দুর্বলতার সম্পর্ক তুলে ধরা।

৬. ঈমান রক্ষায় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব নির্ধারণ

আধুনিক সমাজে ঈমান রক্ষার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দায়িত্ব অপরিসীম।
এই গবেষণায় উদ্দেশ্য থাকবে— ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ঈমান সংরক্ষণের উপায় প্রস্তাব করা। যেমন:

ধর্মীয় শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা,

পরিবারে ইসলামী নৈতিকতার চর্চা,

গণমাধ্যমে ঈমানভিত্তিক কনটেন্ট প্রচার,

তরুণদের জন্য ঈমানভিত্তিক কর্মশালা ও দাওয়াতি কার্যক্রম।

আল্লাহ বলেন —

> “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে রক্ষা কর আগুন থেকে।”
(সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)

## ৭. আধুনিক যুগে ঈমানের চ্যালেঞ্জ অনুধাবন

বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম সমাজ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন — যেমন নাস্তিকতা, উদারবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন — এসবের কারণে ঈমানের ওপর প্রবল আঘাত এসেছে।
এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো— এসব চ্যালেঞ্জকে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ করা এবং তার সমাধান উপস্থাপন করা।

ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন,

> “যে জ্ঞান ও প্রমাণ দ্বারা ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছাড়া ঈমান টিকে না।”
(মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪)

অতএব, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ঈমান দৃঢ় করার পথ অনুসন্ধান করা হবে।

## ৮. ইসলামী ইতিহাস ও নবীজীর (সা.) জীবনে ঈমানের চর্চা

ঈমানের বাস্তব উদাহরণ নবী করিম ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়।
এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো— ইসলামী ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করা যেখানে ঈমান পরীক্ষিত হয়েছে, যেমনঃ বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ, এবং কীভাবে সাহাবীগণ ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।
এই আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক মুসলমানদের জন্য বাস্তব শিক্ষা তুলে ধরা হবে।

## ৯. গবেষণার সামগ্রিক লক্ষ্য

এই গবেষণার সার্বিক লক্ষ্য হলো—

> ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ বিষয়ে একটি প্রমাণভিত্তিক, ধর্মীয় ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা,
যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে ঈমান রক্ষার সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর লক্ষ্য হলো—
১. ইসলামী আকীদার সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠা,
২. ঈমান রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি,
৩. ঈমানভিত্তিক নৈতিক সমাজ নির্মাণে দিকনির্দেশনা প্রদান।

ঈমানই মানবজীবনের আলোকবর্তিকা, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরমুক্তি লাভ করে।
নবী করিম ﷺ বলেন —

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে ঈমান রাখে, সে সফলকাম।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮)

অতএব, ঈমানের শুদ্ধ ধারণা ও রক্ষণাবেক্ষণই এই গবেষণার পরম উদ্দেশ্য।
হলো তার প্রশ্নাবলি।

কারণ গবেষণার দিকনির্দেশ, কাঠামো ও বিশ্লেষণ এই প্রশ্নগুলোর ওপর নির্ভর করে।

একটি সুচিন্তিত গবেষণা প্রশ্ন গবেষককে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে।

এই গবেষণার মূল বিষয় "ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ" — যা ইসলামী আকীদা, নৈতিকতা, সমাজতত্ত্ব এবং ধর্মীয় দর্শনের সংমিশ্রণ।

এই বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান অপরিহার্য, যা ঈমানের মূল ধারণা, এর অন্তর্নিহিত শর্তাবলি, এবং এর পতনের কারণসমূহকে স্পষ্ট করে তোলে।

১. ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ কী এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সীমানা কোথায়?

গবেষণার প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হলো —

“ঈমান বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় এবং এর সীমানা কোথায় নির্ধারিত?”

আরবি শব্দ “إيمان” এর অর্থ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা। কিন্তু ইসলামী দর্শনে এটি কেবল মুখের উচ্চারণ নয়; বরং তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয় —

১ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস

২ মুখের স্বীকারোক্তি

৩ এবং কর্মের বাস্তব প্রয়োগ

এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই এই গবেষণার অন্যতম মূল লক্ষ্য।

কারণ বর্তমানে অনেকেই ঈমানকে কেবল “মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাস” মনে করেন, অথচ ইসলামী আকীদাহ অনুযায়ী কর্মও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণায় নির্ধারণ করা হবে —

ইসলামী পরিভাষায় ঈমানের ধারণা কিভাবে বিকশিত হয়েছে,

ইমামগণ (যেমন ইমাম আহমাদ, শাফেয়ী, ইবনে তাইমিয়্যা প্রমুখ) ঈমানের সংজ্ঞা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

এবং আধুনিক যুগে ঈমানের সঠিক সীমানা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা কী।

২. ঈমানের মৌলিক শর্তসমূহ কী এবং কোন উপাদানগুলো ঈমানকে পূর্ণতা দেয়?

দ্বিতীয় গবেষণা প্রশ্ন —

“ঈমানের মূল শর্তগুলো কী এবং কীভাবে এগুলো ব্যক্তির ধর্মীয় চেতনায় প্রতিফলিত হয়?”

নবী করিম ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন —

> “ঈমান হলো: আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাব, রাসুলগণ, আখিরাত ও তাকদীর — ভালো ও মন্দ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮)

এই ছয়টি রুকন ঈমানের ভিত্তি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে —

ঈমানের এই শর্তগুলো কেবল তাত্ত্বিক স্বীকারোক্তি, নাকি বাস্তব জীবনের দিকনির্দেশ?

এই শর্তগুলোর অভাবে কি ঈমান অসম্পূর্ণ হয়ে যায়?

এবং আধুনিক মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাসের দুর্বলতা কীভাবে ঈমানের পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

এই গবেষণা প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি রুকনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে —

যেমন, আল্লাহতে বিশ্বাস কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নয়, বরং জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে গ্রহণ করা;

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান মানে অদৃশ্য জগতের প্রতি আস্থা রাখা;

কিতাবসমূহে বিশ্বাস মানে আল্লাহর বিধানকে চূড়ান্ত নির্দেশনা হিসেবে মান্য করা;

৩. ঈমান ও আমলের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কী?

তৃতীয় গবেষণা প্রশ্ন —

“ঈমান ও আমল কি পৃথক দুটি বিষয়, নাকি তারা পরস্পরের পরিপূরক?”

এই প্রশ্ন ইসলামী চিন্তায় দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত একটি দার্শনিক বিতর্ক।

কেউ বলেন, আমল ঈমানের অংশ নয়; আবার কারো মতে, আমল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ।

নবীজী ﷺ বলেন —

> “ঈমান হলো সত্তরাধিক শাখা বিশিষ্ট।” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ, ঈমানের একটি অংশ মুখের স্বীকৃতি, আরেকটি অংশ কর্মের বাস্তবায়ন।

এই প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণায় খুঁজে দেখা হবে —

ইসলামী ইতিহাসে ঈমান-আমলের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন মাজহাবের মতামত কী,

এবং আজকের সমাজে ঈমানকে কেবল অন্তরীয় বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা কীভাবে ধর্মীয় অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে।

এই প্রশ্নের আলোকে প্রমাণিত হবে যে, কর্মবিহীন ঈমান শুষ্ক তত্ত্বে পরিণত হয়, আর আমলবিহীন বিশ্বাস সমাজে নৈতিকতা স্থাপন করতে পারে না।

৪. ঈমান ভঙ্গের প্রধান কারণসমূহ কী এবং সেগুলো কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজে প্রভাব ফেলে?

গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো —

“ঈমান ভঙ্গের কারণ কী এবং এর সামাজিক-নৈতিক প্রভাব কতটা গভীর?”

ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থে ঈমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে —

১◇ শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার করা),

২ কুফরি (সত্য প্রত্যাখ্যান করা),

৩ রিয়া (দেখানোর জন্য কাজ করা),

৪ নিফাক (মুনাফিকি),

৫ অহংকার ও অজ্ঞতা,

৬ নৈতিক অবক্ষয় ও পাপাচার।

কীভাবে এই কারণগুলো ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দুর্বল করে,

সমাজে কীভাবে নৈতিক শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে,

এবং ঈমান ভঙ্গের প্রক্রিয়া কীভাবে ধীরে ধীরে আত্মিক মৃত্যু ডেকে আনে।

এছাড়া আধুনিক যুগে বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনযাপন, ও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব— কীভাবে মুসলিম সমাজের ঈমানকে নষ্ট করছে, তা বিশ্লেষণ করা হবে।

৫. ঈমান দুর্বলতা ও পতনের সামাজিক প্রতিফলন কীভাবে প্রকাশ পায়?
পঞ্চম গবেষণা প্রশ্ন —

“যখন সমাজে ঈমান দুর্বল হয়, তখন তার সামাজিক প্রতিফলন কীভাবে দৃশ্যমান হয়?”
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন কোনো সমাজে ঈমান দুর্বল হয়, তখন সেখানে—
দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়,
নৈতিকতা হারিয়ে যায়,
সামাজিক অবিচার ছড়িয়ে পড়ে,
এবং মানবিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়।
আল্লাহ বলেন —
> “যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য বরকতের দরজা খুলে দিতাম।”

(সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:৯৬)
এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণায় প্রমাণ করা হবে যে, সমাজের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ ঈমানের দুর্বলতা।

যেখানে ঈমান শক্তিশালী, সেখানে ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান; আর যেখানে ঈমান দুর্বল, সেখানে বিশৃঙ্খলা, হিংসা ও অন্যায় বেড়ে যায়।
৬. আধুনিক যুগে ঈমান রক্ষার চ্যালেঞ্জ কী এবং এর মোকাবিলায় ইসলামী কৌশল কী হতে পারে?
এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য —
“বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ঈমান কীভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমাধান কী হতে পারে?”
বর্তমান সময়ে মুসলমানরা সম্মুখীন
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা,
নাস্তিকতা ও উদারবাদ,
বস্তুবাদী জীবনধারা,
এবং সামাজিক মাধ্যমে নৈতিক বিপর্যয়।
এই প্রশ্নের আলোকে গবেষণায় দেখা হবে —

ইসলাম কীভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর দিকনির্দেশ দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে —

وَمِنَ النَّا سِ وَا لدَّوَآ بِّ وَا لْاَ نْعَا مِ مُخْتَلِفٌ اَ لْوَا نُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَا دِهِ الْعُلَمٰٓ ؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝

"তেমনিভাবে মানুষ, জীব-জন্তু আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও রয়েছে তাদের বিভিন্ন রং। আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী। আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।"

(সুরা ফাতির আয়াত -২৮)
অর্থাৎ, জ্ঞান ও আত্ম-চেতনার মাধ্যমে ঈমান রক্ষা করা সম্ভব।

৭. ঈমান রক্ষায় শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

আরেকটি মৌলিক গবেষণা প্রশ্ন হলো —

“ঈমান সংরক্ষণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কী?”

এই প্রশ্নের আলোচনায় নির্ধারণ করা হবে —

ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব,

পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার প্রভাব,

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা,

এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে ঈমানভিত্তিক মূল্যবোধের প্রতিফলন।

আল্লাহ বলেন —

> “তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে রক্ষা কর আগুন থেকে।”

(সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)

অতএব, এই প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণায় পারিবারিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক কাঠামোতে ঈমান দৃঢ় করার বাস্তব দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে।

সুতরাং,

এই গবেষণার প্রশ্নাবলিগুলো মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত —

১ ধর্মীয় (আকীদাগত) প্রশ্ন — ঈমানের প্রকৃতি, শর্ত ও সম্পর্ক।

২ নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন — ঈমান ভঙ্গের কারণ ও সমাজে তার প্রভাব।

৩ আধুনিক চ্যালেঞ্জভিত্তিক প্রশ্ন — বিশ্বায়নের যুগে ঈমান রক্ষার পদ্ধতি।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবে।

এর মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে যে, ঈমান শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয় — এটি এক পূর্ণাঙ্গ সামাজিক দর্শন, যা ন্যায়, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

**৭.থিসিসের গুরুত্ব**

গবেষণারই একটি নির্দিষ্ট তাৎপর্য থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে গবেষণাটি সমাজ, জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলে।

এই গবেষণার বিষয় — "ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ" — এমন একটি বিষয় যা ইসলামি আকীদাহ ও মানবজীবনের মূল ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত।

ঈমান ছাড়া ইসলাম নেই, আর ঈমান ছাড়া মানবজীবনে প্রকৃত শান্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

> "যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"
(সূরা আন-নিসা, ৪:১২২)

কিন্তু আধুনিক যুগে ঈমানের ধারণা ও প্রয়োগ অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ঈমানের প্রকৃত চেতনা অনেকাংশে হারিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার তাৎপর্য অপরিসীম।

১. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে গুরুত্ব

ঈমান ইসলামের প্রথম স্তম্ভ।

নবী করিম ﷺ বলেছেন —

> "ইসলাম গঠিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর: (১) কালেমা পাঠ, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) যাকাত, (৫) হজ।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮)
এই পাঁচ স্তম্ভের প্রথমটি হলো "ঈমান" — যা ছাড়া অন্য কোনো স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অতএব, ঈমানের সঠিক ধারণা, এর মৌলিক শর্ত, ও এর ক্ষয় বা পতনের কারণ অনুধাবন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ধর্মীয়ভাবে অপরিহার্য।

এই গবেষণার ধর্মীয় গুরুত্ব হলো —

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান,

ইসলামী আকীদাহর ভিত্তি পুনরুজ্জীবিত করা,

এবং আধুনিক বিভ্রান্ত চিন্তাধারার জবাব প্রদান করা।

বর্তমান সময়ে “ঈমান মানে শুধু অন্তরের বিশ্বাস” — এই ভুল ধারণা অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই গবেষণা সেই ভুল ধারণা সংশোধনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২. জ্ঞান ও চিন্তার দিক থেকে গুরুত্ব

ইসলামী চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হলো সঠিক আকীদা বা বিশ্বাস।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় আকীদাহ বিষয়ক গভীর গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

ফলে মুসলিম তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ঈমানের সঠিক ধারণা দুর্বল হচ্ছে।

এই গবেষণার জ্ঞানগত গুরুত্ব হলো —

ঈমানের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রমাণ বিশ্লেষণ,
বিভিন্ন ইসলামী পণ্ডিতের মতামতের তুলনামূলক পর্যালোচনা,
এবং আকীদাগত বিভ্রান্তির বৈজ্ঞানিক জবাব প্রদান।

এতে ইসলামী জ্ঞানের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বিশেষ করে, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইবনে তাইমিয়্যা, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ আলেমদের ব্যাখ্যার আলোকে ঈমানের ধারণাকে আধুনিক যুক্তির পরিসরে ব্যাখ্যা করা হবে।

ফলস্বরূপ, গবেষণাটি ইসলামি চিন্তাবিদ, ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য একটি প্রামাণ্য তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

৩. নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গুরুত্ব
ঈমানের দুর্বলতা নৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ।

যেখানে ঈমান শক্তিশালী, সেখানে সততা, ন্যায়, দয়া, মানবতা ও আত্মসংযম বিরাজ করে।

কিন্তু যেখানে ঈমান দুর্বল, সেখানে দুর্নীতি, মিথ্যা, অন্যায়, হিংসা ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন —
> "যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকত খুলে দিতাম।"

(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯৬)
অতএব, সমাজের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য ঈমান অপরিহার্য।

এই গবেষণার সামাজিক গুরুত্ব হলো —
সমাজে ঈমানভিত্তিক নৈতিকতা জাগ্রত করা,
সামাজিক অবিচার ও দুর্নীতির উৎস হিসেবে ঈমান দুর্বলতার বিশ্লেষণ করা,

এবং সমাজে ঈমানভিত্তিক নেতৃত্ব ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা।
বিশেষত, তরুণ প্রজন্মের নৈতিক চরিত্র গঠনে এই গবেষণা একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।
৪. শিক্ষাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে গুরুত্ব
আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সময় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়।

ফলস্বরূপ, জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটলেও চরিত্রের উন্নয়ন ঘটে না।

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো — শিক্ষা ব্যবস্থায় ঈমানভিত্তিক মূল্যবোধ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

এ গবেষণার শিক্ষাগত গুরুত্ব হলো —
ইসলামি স্টাডিজ ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষায় ঈমান বিষয়ক গভীর গবেষণা উপকরণ হিসেবে কাজ করা,
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আকীদাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা জাগানো,

এবং ঈমানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।
ইসলামী শিক্ষা কেবল ইবাদতের শিক্ষা নয়, বরং তা মানবিক চরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যম।

এই গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ঈমানভিত্তিক পাঠ্যক্রম উন্নয়নে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

৫. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্ব
বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মুসলমানরা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারবাদ, বস্তুবাদ, এবং প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন — সবই ঈমানকে দুর্বল করছে।
এই গবেষণা আধুনিক যুগের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি চিন্তাগত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

এতে ব্যাখ্যা করা হবে —
কীভাবে সামাজিক মাধ্যম ও সংস্কৃতির আগ্রাসন ঈমান দুর্বল করছে,

কীভাবে আধুনিক শিক্ষা ও মিডিয়া তরুণদের আকীদা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে,

এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায়।

ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) বলেছেন —

> “যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়া ঈমান দাবি করে, তার ঈমান টেকসই হয় না।”
(মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪)

এই গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক মুসলিম সমাজে জ্ঞানভিত্তিক ঈমান রক্ষার এক কার্যকর পদ্ধতি প্রস্তাব করা হবে।

৬. গবেষণার ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক গুরুত্ব

এই গবেষণার ফলাফল শুধু তাত্ত্বিক নয়; বরং এর বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।
ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান দৃঢ় করার অনুপ্রেরণা প্রদান করবে,
পারিবারিক জীবনে নৈতিকতা ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করবে,

সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে,
এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও দাওয়াতি কার্যক্রমের ভিত্তি শক্তিশালী করবে।
অতএব, এই গবেষণার মাধ্যমে এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াতি কাঠামো গড়ে উঠতে পারে, যা আধুনিক সমাজে ঈমান রক্ষায় বাস্তব ভূমিকা রাখবে

৭. ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করার দিক থেকে গুরুত্ব
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আকীদা ও ঈমান সম্পর্কিত গভীর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

এই থিসিস সেই ঘাটতি পূরণে একটি প্রামাণ্য অবদান রাখবে।

গবেষণাটি —

ইসলামী দর্শনের ছাত্রদের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে,

ইসলামি সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিকতা গবেষণায় নতুন অধ্যায় সংযোজন করবে

এবং ঈমান বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অতএব, গবেষণাটি ইসলামী চিন্তা, নৈতিকতা, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মীয় দর্শনের সংযোগ স্থাপনে সহায়ক হবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এই গবেষণার গুরুত্ব বহুমাত্রিক —

১ ধর্মীয়ভাবে এটি ঈমানের প্রকৃত ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস,

২ জ্ঞানগতভাবে এটি ইসলামী আকীদাহর একটি শক্তিশালী বিশ্লেষণ,

৩ সমাজতাত্ত্বিকভাবে এটি নৈতিকতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পথনির্দেশ,

৪ এবং বাস্তবিকভাবে এটি আধুনিক মুসলমানদের ঈমান রক্ষার কৌশল নির্ধারণের একটি প্রয়াস।
ঈমান হলো মুসলমানের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

এটি রক্ষা, বিকাশ ও দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই গবেষণার মাধ্যমে সেই চিরন্তন সত্য পুনরায় স্পষ্ট হবে।

> “নিশ্চয় সফল হলো সে, যে ঈমান আনলো।”

(সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১)

## ৮. সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার যেকোনো বিষয়ের ওপর কাজ করার আগে পূর্ববর্তী সাহিত্য, গবেষণা, ও প্রামাণ্য দলিল পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।
এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো “ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ” বিষয়ক পূর্ববর্তী ইসলামী ও আধুনিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা,
যাতে বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ঈমান বিষয়ক সাহিত্য ইসলামী ইতিহাসের সূচনা থেকেই বিস্তৃতভাবে রচিত হয়েছে।

কুরআন মজীদে প্রায় ৬০০-রও বেশি আয়াতে ঈমান, কুফর, তাকওয়া, নিফাক ইত্যাদি ধারণার উল্লেখ রয়েছে।
হাদীসে ঈমানের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় — যেমন "ইমান বিল্লাহ", "ইমান বিল গাইব", "শু'আবুল ঈমান" ইত্যাদি বিষয়।
এরপর সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মধ্যযুগীয় আলেমগণ আকীদাহ বিষয়ক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রাচীন থেকে আধুনিক সাহিত্যধারার একটি সমন্বিত পর্যালোচনা করব।

২. কুরআন মজীদে ঈমান বিষয়ক সাহিত্যিক বিশ্লেষণ

২.১ ঈমান শব্দের ব্যবহার ও অর্থ

কুরআনে "إيمان" শব্দটি প্রায় ৮৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
এর মৌলিক অর্থ হলো "দৃঢ় বিশ্বাস", "আস্থা", "নিশ্চয়তা" এবং "অন্তরের স্বীকৃতি"।
আল্লাহ তায়ালা বলেন —

" ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ"...ْ
"মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর কাঁপে যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।"
(সূরা আল-আনফাল, ৮:২)

তাফসিরে ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন —

মুনাফিকরা যখন নামায আদায় করে তখন কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না । না তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, না আল্লাহর উপর ভরসা করে। যখন তারা বাড়ীতে অবস্থান করে তখন নামায আদায় করে না। আর তারা যাকাতও দেয় না। আল্লাহ পাক এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুমিন কখনও এরূপ হয় না। এখানে মুমিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন তারা কুরআন পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলো বিশ্বাস করে বলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ

ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করে না। মুমিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে, কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে থাকে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা এমন লোক যে, যখন তারা এমন কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় অথবা নিজেদের উপর অত্যাচার করে বসে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের পাপরাশির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে পাপসমূহ ক্ষমা করবে? আর তারা নিজেদের (মন্দ কর্মে) হঠকারিতা করে না এবং তারা অবগত।" অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার যাদের ভয় রয়েছে এবং যারা কুপ্রবৃত্তিকে অন্যায় ও অবৈধভাবে পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারাই জান্নাতের হকদার।"

সুদ্দী (রঃ) মুমিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ "সে ঐ ব্যক্তি যে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়- 'আল্লাহকে ভয় কর তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।"

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, লোম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা, ঐ সময় দুআ কবূল হয়ে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে- কুরআন শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন তিনি বলেনঃ যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন কেউ বলে, এই আয়াত দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে কথা এই যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে পূর্ব থেকেই মুমিন। আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যেই। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। জমহুর ইমামদের মাযহাব এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম আবু উবাইদ (রঃ)। আমরা এটা শরহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْن অর্থাৎ তারা তিনি ছাড়া আর কারো কাছে কোন আশাই করে না, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাঁকেই মনে করে থাকে। কিছু চাইলে তার কাছেই চেয়ে থাকে। প্রতিটি কাজে তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা চাইবেন তাই হবে এবং যা চাইবেন না তা হবে না। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুরই মালিক

একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারে না। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের বন্ধন।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ মুমিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা নামায পড়ে এবং তাদের প্রদত্ত মাল থেকে গরীব দুঃখীদেরকে দান করে থাকে। এ কাজ দু'টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু'টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। নামায প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি হক। ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে নামাযকে সময়মত আদায় করা, অযু করার সময় ভালরূপে হাত মুখ ধৌত করা, রুকু-সিজদায় তাড়াহুড়া না করা এবং আদব সহকারে কুরআন মাজীদ পাঠ করা এবং নবী (সঃ)-এর উপর তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠ করা। এটাই ইকামাতে সালাত এবং يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوة দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আর يُنْفِقُوْنَ -এর ভাবার্থ এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের নেসাবে পৌছে যায় তবে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই মানুষকে দান করতে থাকবে। বান্দাদের ওয়াজিব ও মুসতাহাব আর্থিক হক আদায় করবে। আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবে। কেননা, সমস্ত লোকই আল্লাহর পরিবার ও সন্তান সন্ততি। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশী স্বীকৃত যে তার সৃষ্টজীবের বেশী উপকার সাধন করে থাকে। তোমাদের মালধন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যেন আমানত স্বরূপ। অতিসত্বরই তোমাদের মাল তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ওর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا এসব গুণে যারা গুণান্বিত তারাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। হারিস ইবনে মালিক (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাকে বলেনঃ "হে হারিস (রাঃ)! সকাল বেলা তোমার কিভাবে কেটেছে?" হারিস (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "খুব চিন্তা করে কথা বল। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা হাকীকত বা মূলতত্ত্ব রয়েছে। বল তো, তোমার ঈমানের হাকীকত কি?" হারিস (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "আমি দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, রাত্রে জেগে জেগে ইবাদত করি, দিনে রোযার কারণে পিপাসার্ত থাকি এবং নিজেকে এরূপ পাই যে, যেন আমার সামনে আল্লাহর আরশ খোলা রয়েছে, আমি যেন জান্নাতবাসীদেরকে পরস্পর মিলিত হতে দেখছি এবং জাহান্নামবাসীদেরকে দেখছি যে, তারা কষ্ট ও বিপদে পতিত হয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যা, হে হারিস (রাঃ)!

তাহলে তুমি ঈমানের হাকীকতে পৌছে গেছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা কর।" একথা তিনি তিনবার বললেন।

কুরআন কারীম আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং حَقًّا শব্দটি সাহিত্যিক মর্যাদা রাখে। যেমন বলা হয়ে থাকে فُلَانٌ سَيِّدٌ حَقًّا অর্থাৎ 'অমুক ব্যক্তি প্রকৃত সরদার', যদিও কওমের মধ্যে অন্যান্য সরদারও রয়েছে। আরও বলা হয়- 'অমুক প্রকৃত ব্যবসিক', যদিও অন্যান্য ব্যবসিকও রয়েছে। অমুক ব্যক্তি প্রকৃত কবি', যদিও আরও বহু কবি রয়েছে।

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِم অর্থাৎ জান্নাতে তারা বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে বড় পদমর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পুণ্যগুলো কবূল করবেন।" জান্নাতবাসীরা একে অপরের অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরকে দেখে অহংকার করবে না এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকে দেখে হিংসাও করবে না।

সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ "উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে তারকারাজি দেখে থাক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি নবীদের মযিল, যা অন্য কেউ লাভ করবে না?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "কেন লাভ করবে না? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবু বকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।"

তাফসিরে আর জাকারিয়া বলেন,

মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় [১] এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে [২]। আর তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে [৩],

[১] এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আয়াতে বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে।" অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভালোবাসায় ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "(হে নবী!) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়।" [সূরা হজ ৩৪] আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর যিকর-এর এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে, "জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর-এর দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রাদ ২৮]

[২] মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, ঈমান যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী দীনি নির্দেশের উপর আমল করা এ তিনটি বস্তুর নাম, সেহেতু এগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে ভালোভাবে জানলো, সে ব্যক্তির ঈমান ঐ ব্যক্তির চেয়ে অবশ্যই বেশী যার সে আয়াতের জ্ঞান নেই। সুতরাং ঈমানদারগণ তাদের ঈমানে সমপর্যায়ের নন। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান অন্যান্য সাহাবাদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। সাহাবীদের ঈমান তাবেয়ীদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। অনুরূপভাবে যারা শরীআতের হুকুম-আহকামের উপর আমল করে, তাদের ঈমান ঐ লোকদের থেকে বেশী যারা শরীআতের হুকুম-আহকাম ঠিকমত পালন করে না। সুতরাং যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও তার বিধান অনুযায়ী না চলেও ঈমানের দাবী করে, তারা মূলতঃ ঈমানই বুঝে না। তাদের ঈমান সবচেয়ে নিমস্তরের ঈমান।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় আর অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। মহান আল্লাহর বাণী:

)وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُم (ْ

"আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন।" [সূরা মুহাম্মাদ ১৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

)اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْن (َ

“মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, এবং যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।” [সূরা আল-আনফাল ২]

অনুরূপ ভাবে তিনি আর বলেন,

)هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ (ۗ

“তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়।” [সূরা আল-ফাতহ ৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে।” [বুখারী ৭৫১০, মুসলিম ১৯৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঈমানের সত্তরের উপর শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হলো: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো হক্ক মা’বুদ নেই, সর্বনিম্ন হলো: পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।” [সহীহ মুসলিম ৫৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে। আর তাদের অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। এমনকি কারো কারো ঈমানের পর্যায় সরিষা পরিমাণে পৌছে যায়। যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লাভ হয় এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই এক হাদীসে ঈমানের মাধুর্য শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। [দেখুন, বুখারী ১৬]

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ মুসলিমরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে থাকে না কুরআনকে বোঝার চেষ্টা, থাকে না কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোনো খেয়াল, আর থাকে না আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরণের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না।

[৩] মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াকুল অর্থ হলো আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য

ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা চালানোর পর সাফল্য আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তারই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন।

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে_

বিশ্বাসী (মুমিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। [১]

[১] এই আয়াতে ঈমানদারদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ (ক) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে; কেবল আল্লাহর অর্থাৎ, কুরআনের আনুগত্য নয়। (খ) আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর মহত্ত্বে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (গ) কুরআন পাঠ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।) (ঘ) তারা নিজ প্রভু (আল্লাহর) উপর ভরসা করে। ভরসা করার অর্থঃ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার করে না, কারণ তা অবলম্বন করার আদেশ মহান আল্লাহই দিয়েছেন। তবে বাহ্যিক উপায়কেই তারা সব কিছু মনে করে না; বরং তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, আসলে সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না। আর এই দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হতে এক পলও গাফেল থাকে না। পরবর্তীতে আরো কিছু গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই সকল গুণের অধিকারীদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত মু'মিন গণ্য করেছেন এবং ক্ষমা, দয়া ও উত্তম জীবনোপকরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। (আল্লাহ আমাদেরকে যেন তাদের দলভুক্ত করেন।)

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ- বদর যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনে সংঘটিত হয়। এটি কাফেরদের সাথে প্রথম যুদ্ধ। এ ছাড়া এ যুদ্ধের কোন পরিকল্পনা ছিল না; বরং তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে যায়। যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র অল্প থাকার কারণে কোন কোন মুসলিম মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। এর প্রেক্ষাপট ছিল এরূপ যে, আবু সুফিয়ান (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) এর নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা শাম হতে মক্কায় ফিরছিল। এদিকে মুসলিমদের হিজরত করার ফলে তাদের ধন-সম্পদ মক্কায় থেকে গিয়েছিল বা কাফেররা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই

সাথে মক্কার কাফেরদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়াও ছিল সময়ের দাবী। উক্ত সকল কারণে রসূল (সাঃ) বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ মদীনা ত্যাগ করেন। আবূ সুফিয়ানের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যায়। সুতরাং তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং মক্কায় এ সংবাদ পৌঁছে দেন। যার ফলে আবূ জাহল একটি সেনাদল নিয়ে কাফেলার হিফাযতের জন্য বদরের দিকে রওনা হয়। যখন নবী (সাঃ) এই পরিস্থিতি জানতে পারেন তখন তা সাহাবাদের নিকট খুলে বলেন। সেই সাথে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথাও ব্যক্ত করেন যে, (বাণিজ্য কাফেলা অথবা সেনাদল) এই দুয়ের মধ্যে একটির সাক্ষাৎ পাবে। তবুও কিছু সাহাবী যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করে বাণিজ্য কাফেলার পিছু নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবীগণ রসূল (সাঃ) সাথে থেকে যুদ্ধে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

> "এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতি নয়; বরং অন্তরের ভয়, চিন্তা ও শ্রদ্ধা দ্বারা তার প্রকাশ ঘটে।"

অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমান হলো অন্তরের অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণের সম্মিলিত প্রকাশ।

## ২.২ ঈমানের রুকনসমূহ কুরআনের আলোকে

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ঈমানের মৌলিক রুকন বা স্তম্ভসমূহ উল্লেখ রয়েছে।

۞لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

(সুরা বাকারা আয়াত:১৭৭)

অর্থঃ

পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্য্যাবলী), যে ঈমান রাখে আল্লাহর, শেষ দিনের ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে এবং

দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।

এ আয়াত নিয়ে তাফসির ইবনে কাসির বলেন__

এই পবিত্র আয়াতে খাটি বিশ্বাস এবং সরল সঠিক পথের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। হযরত আবু যার (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ঈমান কি জিনিস?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন। তিনি পুনরায় এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ পুণ্যের প্রতি ভালবাসা এবং পাপের সাথে শত্রুতার নাম হচ্ছে ঈমান (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম)। কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদ মুনকাতা'। মুজাহিদ (রঃ) এই হাদীসটি হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ হযরত আবু যার (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত সাব্যস্ত হয় না।

এক ব্যক্তি হযরত আবূ যার (রাঃ) কে প্রশ্ন করেঃ ঈমান কি?' তখন তিনি এই আয়াটি পাঠ করেন। লোকটি বলেঃ জনাব! আমি আপনাকে মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করিনি, বরং আমার প্রশ্ন ঈমান সম্বন্ধে।' হযরত আবু যার (রাঃ) তখন বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্নই করেছিল। তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেছিলেন, ঐ লোকটিও তখন তোমার মতই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ মু'মিন যখন সৎ কাজ করে তখন তার প্রাণ খুশি হয় এবং সে পুণ্যের আশা করে আর যখন পাপ করে তখন তার অন্তর চিন্তিত হয় এবং সে শাস্তিকে ভয় করতে থাকে {তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এ হাদীসটিও মুনকাতা।

মু'মিনদেরকে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে কাবা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর এবং কতকগুলো মু'মিনের উপর কঠিন ঠেকে। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দেবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত পুণ্য এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নেবে। যদি কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং শুটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ক্রমে না হয় তবে এর ফলে সে মুমিন হবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার

ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় আছেঃ

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের কোরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছে না, বরং তার কাছে ধর্ম ভীরুতা পৌছে থাকে।' (২২:৩৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "তোমরা নামায পড়বে এবং অন্যান্য আমল করবে না এটা কোন পুণ্যের কাজ নয়। এই নির্দেশ ঐ সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে মদীনার দিকে ফিরে ছিলেন। কিন্তু তারপরে অন্যান্য ফরযসমূহ ও নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয় এবং ওগুলোর উপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য রূপে গণ্য করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহূদীরা পশ্চিম দিকে এবং খ্রীষ্টানেরা পূর্ব দিকে মুখ করতো। সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ 'পুণ্য এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্যকরণীয় কার্যগুলো নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা হয়। সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে পুণ্য সংগ্রহ করেছে। মহান আল্লাহর সত্তার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং এঁরা যে আল্লাহর বাণী তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে থাকেন একথা তারা বিশ্বাস করে। তারা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুরআন শেষ আসমানী কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সৌভাগ্য যার সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নবীর উপরও তাদের ঈমান রয়েছেবিশেষ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। মাল ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে থাকে। সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উত্তম দান এই যে, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও মালের প্রতি তোমার ভালবাসা ও লোভ থাকে, তুমি ধনী হওয়ারও আশা রাখ এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ও ভয় কর।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর তাফসীর-ই-মুস্তাদরিক' নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ পাঠ করতঃ বলেনঃ"এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা সুস্থ

অবস্থায় ও মালের প্রতি চাহিদা থাকা অবস্থায় দারিদ্রকে ভয় করে এবং ধনী হওয়ার ইচ্ছা রেখে দান করবে।' (২:১৭৭) কিন্তু হাদীসটি 'মওকুফ হওয়াই বেশী সঠিক কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এরই উক্তি। কুরআন মাজীদেও সুরা-ই-দাহরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا

অর্থাৎ তারা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ভালবাসার জন্যে দরিদ্র, পিতৃহীন ও বশীকে আহার করিয়ে থাকে। (তারা বলে) আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহার করাচ্ছি, আমরা তোমাদের নিকট এর প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাচ্ছি না।' (৭৬:৮-৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ভালবাসার জিনিস তোমরা (আল্লাহর পথে) খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।' (৩:৯২) অন্যস্থানে বলেছেনঃ وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ তাদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে তাদের জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।' (৫৯:৯) সুতরাং এরা বড় মর্যাদার অধিকারী। কেননা, প্রথম প্রকারের লোকেরাতো তাদের ভালবাসা ও পছন্দনীয় জিনিস অন্যদেরকে দান করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের লোকেরা এমন জিনিস অপরকে দিয়েছেন, যে জিনিসের তারা নিজেরাই মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ذَوِى الْقُرْبٰى আত্মীয়গণকে বলা হয়। দানের ব্যাপারে অন্যদের উপর এদের অগ্রাধিকার রয়েছে।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'মিসকীনকে দান করার পুণ্য একগুণ এবং আত্মীয়। (মিসকীন)-কে দান করার পূণ্য দ্বিগুণ। একটি দানের পুণ্য এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখার পুণ্য। তোমাদের দান ও খয়রাতের এরাই বেশী হকদার।' কুরআন মাজীদের মধ্যে কয়েক জায়গায় তাদের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। ইয়াতীম' এর অর্থ হচ্ছে ঐ ছোট ছেলে যার পিতা মারা গেছে। তার অন্য কেউ উপার্জনকারী নেই। তার নিজের উপার্জন করারও ক্ষমতা নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকে না। মিসকীন ওদেরকে বলা হয় যাদের নিকট এই পরিমাণ জিনিস নেই যা তাদের খাওয়া পরার ও বসবাসের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। তাদেরকেও দান করতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন

মিটাতে পারে এবং তারা দারিদ্র, ক্ষুধা, সংকীর্ণতা এবং অবমাননাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে ভিক্ষার জন্যে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'একটি খেজুর বা দু' এক গ্লাস খাবার দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কাছে এই পরিমাণ জিনিস নেই যদদ্বারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে এবং যে তার অবস্থা এমন করতে পারে না। যদদ্বারা মানুষ তার অবস্থা জেনে তাকে কিছু দান করতে পারে। ইবনু সাবীল মুসাফিরকে বলা হয়। এখানে ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে, যার নিকট সফরের খরচ নেই। তাকে এই পরিমাণ দেয়া হবে যেন সে অনায়াসে তার দেশে পৌঁছতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সফরে বেরিয়েছে তাকেও যাতায়াতের খরচ দিতে হবে। অতিথিও এই নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অতিথিকেও 'ইবনু সাবীলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য মনীষীও এই মতই পোষণ করেছেন। সায়েলীন' ঐ সব লোককে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করতঃ মানুষের নিকট ভিক্ষা করে থাকে। এদেরকেও সাদকা ও যাকাত থেকে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে আসলেও তার হক রয়েছে।' (সুনান-ই-আবু দাউদ)। وَفِى الرِّقَابِ-এর ভাবার্থ হচ্ছে ক্রীত দাসদেরকে দাসত্ব হতে মুক্ত করা। এরা ঐ ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মনিবেরা বলে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এত এত অর্থ দিতে পারে তবে তারা মুক্ত হবে। এদেরকে সাহায্য করে মুক্ত করিয়ে নেয়া। এইসব প্রকারের এবং আরও অন্যান্য প্রকারের লোকদের পূর্ণ বর্ণনা। اِنَّمَا الصَّدَقَات এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ দেয়া হবে। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু হক রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পড়ে শুনান। এই হাদীসে আবূ হামযাহ মায়মুন আ'ওয়ার নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা নামাযকে সময়মত পূর্ণ রুকু সিজদাহ, স্থিরতা এবং বিনয়ের সাথে আদায় করে থাকে। অর্থাৎ যে নিয়মে আদায় করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে ঠিক সেই নিয়মেই আদায় করে থাকে। আর তারা যাকাত প্রদান করে থাকে। কিংবা এই অর্থ যে, তারা নিজেদের আত্মাকে বাজে কথা এবং জঘন্য চরিত্র থেকে পবিত্র রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ـ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

অর্থাৎ আত্মাকে পবিত্রকারী সফলকাম হয়েছে এবং তাকে দমনকারী বিফল মনোরথ হয়েছে।' (৯১:৯-১০) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ - الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ মুশরিকদের জন্যে অকল্যাণ, যারা যাকাত আদায় করে না। (৪১:৬-৭) সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহে যাকাত' এর ভাবার্থ হচ্ছে নফস'-কে পবিত্র করা। অর্থাৎ নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা, শিরক এবং কুফর হতে পবিত্র করা। আবার এর অর্থ মালের যাকাতও হতে পারে। তাহলে তখন নফল সাদকার অন্যান্য নির্দেশ বুঝতে হবে। যেমন উপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য হক রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়। যেমন, আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেছেনঃ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاق অর্থাৎ যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পুরো করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।' (১৩:২০) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে। অন্য একটি হাদীসে আছেঃ ঝগড়ার সময় গালি উচ্চারণ করে। তারপরে আল্লাহ পাক বলেন যে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্যধারণকারী। এই সব কষ্ট ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন"। তাঁরই উপর আমরা নির্ভর করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সব গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যপরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার। তাদের ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ একই রূপ। আর তারা ধর্মভীরুও বটে। কেননা, তারা সদা আনুগত্যের উপরেই রয়েছে এবং নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ হতে বহু দূরে সরে আছে।

তাফসিরে জাকারিয়াায়__

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে [১] তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান [২] আনবে। আর সম্পদ দান করবে তার [৩] ভালবাসায় [৪] আত্মীয়-স্বজন [৫], ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে [৬], অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে [৭]। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

[১] কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, ইয়াহুদীরা ইবাদাতের সময় পশ্চিম দিকে আর নাসারারা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

আল্লাহ্ তাআলা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় বলেন, সালাতে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে না কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীআতের অন্য কোনো হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

[২] অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভেতরই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি সালাতে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনোই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোনো পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

[৩] এখানে দুটি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্র ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। দুই. সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্বেও সে উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাফসীরে বাগভী] এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসে সম্পদের আসক্তি সত্বেও তা ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা থাকা সত্বেও সাদাকাহ করা”। [বুখারী ১৪১৯, মুসলিম ১০৩২]

[৪] এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং

দীনিশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরয হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। [মাআরিফুল কুরআন]

[৫] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয় স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে"। [মুসনাদে আহমাদ ৩/৪০২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৪/৭৮]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকাহ করা হয় তবে তা হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদকাহ। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮]

[৬] অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তেমনিভাবে মু'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

(৭) আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, 'সবর'-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে_

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই;[১] কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।

[১] এই আয়াত ক্বিবলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। একদিকে ইয়াহুদীরা নিজেদের ক্বিবলার (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পশ্চিম দিক) এবং খ্রিষ্টানরা তাদের ক্বিবলার (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্ব দিক)-কে বড়ই গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং এ নিয়ে গর্বও করছিল, অন্য দিকে মুসলিমদের ক্বিবলার পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করছিল। যার কারণে কোন কোন মুসলিমও অনেক সময় আন্তরিক দুঃখবোধ করত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, আসলে পশ্চিম ও পূর্বের দিকে মুখ করাটাই স্বয়ং কোন নেকীর কাজ নয়, বরং এটা তো কেবল এককেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ করণের একটি পদ্ধতি মাত্র। প্রকৃত নেকী হল, আকীদা সম্পর্কীয় সেই সব জিনিসের উপর ঈমান আনা, যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সব আমল ও নৈতিকতার প্রতি যত্ন নেওয়া, যার তিনি তাকীদ করেছেন। এর পরবর্তীতে সেই আকীদা ও আমলগুলো বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান (বিশ্বাস) হল এই যে, তাঁকে তাঁর সত্তা, উপাস্যত্ব ও গুণাবলীতে একক মনে করা, সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁকে পাক-পবিত্র মনে করা এবং কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর কোন অপব্যাখ্যা না করে বা তার কোন কিছুকে নিষ্ক্রিয়য় না মনে করে এবং তার কোন ধরন-গঠন নির্ণয় না করে তা মেনে নেওয়া। শেষ বিচার দিবস, পুনরুত্থান এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করা। 'কিতাব' বলতে সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনা। ফিরিশতাদের অস্তিত্ব ও সকল নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসসমূহের সাথে সাথে আয়াতে উল্লিখিত আমলগুলোর প্রতিও যত্ন নিতে হবে। عَلَى حُبِّهِ এর (ه) সর্বনাম মালের দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ, মালের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তা ব্যয় করা। الْبَأْسَاء থেকে দারিদ্র্য এবং অতীব অভাব الضَّرَّآء থেকে ক্ষতি ও রোগ এবং الْبَأْس থেকে যুদ্ধ ও তার কঠিনতাকে বুঝানো হয়েছে। এই তিনটি অবস্থায় ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানাদি থেকে বিমুখ না হওয়া বড় কঠিন কাজ, তাই এই তিনটি অবস্থাকে বিশেষ করে বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ সত্যিকার ঈমান হলো আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস।

ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন —

> “এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের মূল রুকনগুলো উল্লেখ করেছেন। যারা কেবল নামাজ বা বাহ্যিক কাজকে ঈমান মনে করে, তাদের ধারণা অসম্পূর্ণ।”

এটি থেকে স্পষ্ট হয় — ঈমান একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে অন্তর, মুখ ও কর্মের ঐক্য।

২.৩ ঈমান ও কুফরের পার্থক্য

কুরআনে ঈমানের বিপরীতে "কুফর" (অবিশ্বাস) শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।
আল্লাহ বলেন __

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

(সুরা বাকারা আয়াত: ২৫৭)

অর্থঃ

আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক শয়তান, যারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে।

তাফরির ইবনে কাসিরে__

আল্লাহ তাআলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করবেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শিরকের অন্ধকার হতে বের করে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। শয়তানেরা কাফিরদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, কুফর ও শিরককে সুন্দর ও সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করতঃ ঈমান ও তাওহীদ হতে সরিয়ে রাখে এবং সত্যের আলো হতে সরিয়ে অসত্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এরাই ُ শব্দটিকে এক বচন এবং نُوْرকাফির ও এরাই নরকের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। ُ শব্দটিকে বহু বচন আনার কারণ এই যে, হক, ঈমান ও সত্যের পথ একটিই। ظُلُمَات কিন্তু কুফর কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কুফরের অনেক শাখা রয়েছে ঐগুলো সবই বাতিল وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ অসত্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ আমার সঠিক পথ এটাই, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর; অন্যান্য পথসমূহে চলো না, নতুবা তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে; এভাবেই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা বাঁচতে পার (৬:১৫৩)।' আর এক জায়গায় রয়েছেঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْر অর্থাৎ এবং তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো করেছেন। এই প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সত্যের একটিই পথ এবং বাতিলের বিভিন্ন পর্থ রয়েছে। হযরত আইয়ুব বিন খালিদ (রাঃ) বলেন যে,ইচ্ছা পোষণকারীদেরকে অথবা পরীক্ষাকৃতদেরকে উঠানো হবে। অতঃপর যার কামনা শুধুমাত্র ঈমানই হবে সে ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ চেহারা বিশিষ্ট হবে; আর যার কুফরের বাসনা হবে সে কৃষ্ণ ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

তাফসিরে জাকারিয়ায়_

আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় [১]। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

[১] এখানে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে__

আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন)। তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

তাফসিরে আল-কুরতুবী (রহ.) বলেন —

> “ঈমান হলো আলোর পথ, যা আল্লাহর নির্দেশে হৃদয়ে প্রবেশ করে; আর কুফর হলো অন্ধকার, যা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।”
এই আয়াত কুরআনীয় সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের সামাজিক ও মানসিক প্রভাবও তুলে ধরে।

২.৪ ঈমানের পরীক্ষা ও দৃঢ়তা

কুরআনে বারবার বলা হয়েছে — ঈমান কেবল মুখের দাবি নয়, বরং তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানিত হয়।

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

(সুরা আনকাবুত আয়াত :২)

অর্থ:

মানুষ কি মনে করে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?

তাফসির ইবনে কাসির,

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ মুমিনদেরকেও পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে- এটা অসম্ভব।

সহীহ হাদীসে এসেছেঃ “সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় মুমিনদের উপর, তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়েও নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর। পরীক্ষা তাদের দ্বীনের অনুপাতে হয়ে থাকে। যদি সে তার দ্বীনের উপর দৃঢ় হয় তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয় এবং বিপদ-আপদ তার উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন (৩:১৪২) অনুরূপ আয়াত সূরায়ে বারাআতেও রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরায়ে বাকারায় বলেনঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠেছিল- আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যা, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" (২:২১৪) এই জন্যেই এখানেও বলেনঃ আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। এর দ্বারা এটা মনে করা চলবে না যে, আল্লাহ এটা জানতেন না। বরং যা হয়ে গেছে। এবং যা হবে সবই তিনি জানেন। এর উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত ইমাম একমত। এখানে عِلْم অর্থ رُؤْيَت বা দেখার অর্থে ব্যবহৃত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) لِنَعْلَم -এর অর্থ لِنَرٰى করেছেন। কেননা, দেখার সম্পর্ক বিদ্যমান জিনিসের সাথে হয়ে থাকে এবং عِلْم এর عَام থেকে বা সাধারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! অর্থাৎ যারা ঈমান আনয়ন করেনি তারাও যেন এ ধারণা না করে যে, তারা পরীক্ষা হতে বেঁচে যাবে। তাদের জন্যে বড় বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। তারা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবে না। তাদের ধারণা খুবই মন্দ, যার ফল তারা সত্বরই জানতে পারবেন।

তাফসিরে আবু জাকারিয়া,

মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা [১] না করে অব্যাহতি দেয়া হবে [২]?

[১] يفتنون শব্দটি فتنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। [ফাতহুল কাদীর] ঈমানদার বিশেষতঃ নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল। [ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোনো সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোনো সময়

এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালামের হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াত সেসব সাহাবীগণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যাক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় নবীগণকে, তারপর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ, তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্রত্যেক মানুষকে তার দীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযী ২৩৯৮, ইবন মাজহ ৪০২৩] কুরআনের অন্যত্রও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেমন ‘তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ্ এখনো তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে তাদের জেনে নেননি।” [সূরা আত-তাওবাহ ১৬]

[২] যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু‘আয্যামায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোনো প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবন আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, ‘যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা‘বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো‘আ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, “তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চেয়ে বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু’টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহ্র কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান‘আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।” [বুখারী ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদ ৫/১০৯]

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ্ মুমিনদেরকে বুঝান, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি

রয়েছে কোনো ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবেই। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।" [সূরা আল-বাকারাহ ২১৪] অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলিমদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুযোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়: "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ্ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" [সূরা আলে ইমরান ১৪২] প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মুসলিমদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়।

তাফসিরে আহসানুল বায়ান,

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? [১]

[১] অর্থাৎ, মৌখিকভাবে ঈমান আনার পর তাদের কোন পরীক্ষা না নিয়েই এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে --এই ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। বরং তাদের জান-মালে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং অন্যান্য সমস্যা দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে, যাতে আসল-নকল, সত্য-মিথ্যা এবং মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

তাফসিরে সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বলেন —

> "এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ঈমান দাবি করা সহজ; কিন্তু তা রক্ষা করা কঠিন।"

অতএব, ঈমানের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ কেবল তত্ত্ব নয়; বরং তা বাস্তব জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
৩. হাদীস সাহিত্য ও ঈমান বিষয়ক পর্যালোচনা

৩.১ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ঈমান অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "সহীহ বুখারী"-এর প্রথম খণ্ডেই "কিতাবুল ঈমান" নামে একটি পূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছেন।
তিনি প্রথম হাদীসেই বলেন —

" <الأعمال بالنيات— "

"সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

এই হাদীস দ্বারা বোঝানো হয় যে, ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক।

এরপর ইমাম বুখারী উল্লেখ করেন নবীজী ﷺ-এর এই বাণী —

" <الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق".
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৯)

অর্থাৎ ঈমানের বহু শাখা রয়েছে — সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা, আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র হলো রাস্তায় কাঁটা সরিয়ে দেওয়া।

তাফসিরকারগণ বলেন —

> "এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈমান কেবল বিশ্বাস নয়; বরং তার ব্যবহারিক প্রকাশ কর্মের মাধ্যমে ঘটে।"

৩.২ ইমাম মুসলিমের ঈমান অধ্যায়:

ইমাম মুসলিম তাঁর “সহীহ মুসলিম”-এও একটি পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন “কিতাবুল ঈমান”-এর জন্য।
তাঁর মতে —
> “ঈমান হলো অন্তরের দৃঢ় স্বীকৃতি, মুখের প্রকাশ ও কর্মের অনুসরণ।”

তিনি উল্লেখ করেন নবীজীর এই হাদীস —

“ حمن قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة”.
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৩৪)

তাফসিরে ইমাম নওয়াবী (রহ.) বলেন —

> “মুখে কালেমা বলা যথেষ্ট নয়, যদি অন্তরের বিশ্বাস ও কর্ম তার সাথে না মেলে।”

অতএব, হাদীস সাহিত্য ঈমানকে একটি সার্বিক বিশ্বাস-ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করে
৪. সাহাবী ও তাবে‘ঈন যুগের সাহিত্য

সাহাবী যুগে ঈমান বিষয়ক আলোচনা ছিল জীবন্ত বাস্তবতা।
যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন —

> “আমরা ঈমান শিখতাম প্রথমে, তারপর কুরআন পাঠ করতাম; আজকের মানুষ কুরআন শেখে কিন্তু ঈমান শেখে না।”

তাবে‘ঈনদের যুগে যেমন হাসান বসরী (রহ.), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহ.), ও মুজাহিদ (রহ.) আকীদাহ ও ঈমান বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
তাদের লেখায় ঈমানকে সর্বদা অন্তরের প্রশান্তি ও নৈতিকতার মূল উৎস হিসেবে দেখা হয়।

৬. প্রাচীন ইসলামী আকীদাহ গ্রন্থে ঈমান বিষয়ক আলোচনা

৬.১ ইমাম তাহাবী (রহ.)

ইমাম তাহাবী তাঁর গ্রন্থ "মারা কিতাবুল ঈমান"-এ ঈমানকে একটি জীবন্ত অনুশীলনের ধারণা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর মতে, ঈমান হলো —

1. অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস,

2. মুখের স্বীকৃতি,

3. কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত বাস্তবতা।

তাহাবী বলেন —

> "যে ব্যক্তি কেবল মুখে ঈমান ঘোষণা করে, কিন্তু অন্তর ও কর্মে তা প্রকাশিত না হয়, সে ঈমান সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারে না।"
এখানে আমাদের দেখা যায় হাদীস ও কুরআন থেকে সংগৃহীত শিক্ষা প্রাচীন আকীদাহ সাহিত্যেও অপরিবর্তিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬.২ ইমাম গাজ্জালী (রহ.)

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাজ্জালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইহ্যাউ উলুমুদ্দীন-এ ঈমানকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

গাজ্জালীর মতে ঈমান কেবল বিশ্বাস নয়; এটি অন্তরের শুদ্ধতা, আত্মসংশোধন, এবং আচরণগত মিলন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

তিনি বলেন — "যে ব্যক্তি তার অন্তর ও মুখকে ঈমানের প্রতি অভ্যস্ত করে, কিন্তু কর্মে তা প্রকাশ করে না, তার ঈমান অসম্পূর্ণ।"

তিনি মানবীয় দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন (ইখলাস, তওবা, জিহাদুল নফস) কে ঈমানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গাজ্জালীর ব্যাখ্যা আধুনিক নৈতিক শিক্ষা ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আমাদেরকে দেখায় যে, ঈমান কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, বরং সমাজে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমও বটে।

৬.৩ ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ঈমানের বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক দিকগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর মতে ঈমান তিনটি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত:

1. তাওহীদ (ঈমানের ভিত্তি আল্লাহর একত্বে)

2. আখিরাত (পরকালের প্রতি বিশ্বাস)

3. আচরণগত অনুশীলন (আদর্শময় জীবনযাপন)
ইবনে তাইমিয়্যা বলেন —

> “ঈমানকে শুদ্ধভাবে ধারণ করতে হলে, কেবল ধর্মীয় আচার পালন যথেষ্ট নয়; অন্তরের বিশ্বাস এবং কর্মে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।”

তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো নৈতিক দুর্বলতা এবং ধর্মীয় অনুশীলনের প্রতি উদাসীনতা।

৭. মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইসলামী আলেমদের সাহিত্য

৭.১ ইমাম সাইয়িদ কুতুব

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়িদ কুতুব তাঁর গ্রন্থ “ফি জিলালিল কুরআন”-এ ঈমানকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঈমানের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিবর্তন করা,

কেবল ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তি নয়।

কুতুব বলেন — "যে ব্যক্তি ঈমানকে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে ধারণ করে, কিন্তু সমাজে তার প্রভাব না ফেলে, সে ঈমানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ।"

৭.২ ইমাম ইয়াসিন কামাল

ইমাম ইয়াসিন কামাল তাঁর গবেষণায় ঈমানকে একটি সামাজিক ও নৈতিক শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

তাঁর মতে, ঈমান মানুষের আত্মশৃঙ্খলা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক আদর্শ রক্ষা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এটি সমাজে ঐক্য, শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।

এটি আমাদের দেখায়, আধুনিক গবেষণায়ও প্রাচীন ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

৮. তাফসিরে ঈমান বিষয়ক ব্যাখ্যা

৮.১ ইবনে কাসীরের তাফসির

ইবনে কাসীর বলেন —

> "ঈমান হলো অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ। যে ব্যক্তি এই তিনটি স্তম্ভ অনুসরণ করে, সে পূর্ণ ঈমান অর্জন করে।"

৮.২ আল-কুরতুবীর তাফসির

আল-কুরতুবী বলেন —

> “ঈমানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এটি কেবল বিশ্বাস নয়, বরং অন্তর, মুখ ও কাজের একত্রিত প্রকাশ।”

৮.৩ তাফসিরে তাবারী

তাফসিরে তাবারী উল্লেখ করেন —

> “কেউ যদি মুখে ঈমান স্বীকার করে কিন্তু অন্তরে তা না থাকে, তাকে কেবল নামমাত্র মুমিন বলা যায়। পূর্ণ ঈমান অর্জন করতে হলে অন্তরের বিশ্বাস অপরিহার্য।”

৯. সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য ও ঈমানের প্রভাব

৯.১ মুসলিম সমাজে ঈমানের ভূমিকা

ইসলামী সাহিত্য ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়,
ঈমান সামাজিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি।

সাহাবী যুগের উদাহরণ: আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সমাজে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।

মধ্যযুগে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা: মাদ্রাসা ও হাদিস কেন্দ্রগুলি ঈমানের শিক্ষা প্রচারের মূল ক্ষেত্র।

আধুনিক সমাজে, ইসলামী নৈতিক শিক্ষা যুব সমাজে সততা, ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে।

৯.২ সাহিত্যিক ব্যাখ্যা

আধুনিক গবেষকরা যেমন মালেক আবদুল, হোসেন নাসিরউদ্দিন লেখায় উল্লেখ করেছেন,

> “ঈমান ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে বেশি — এটি সমাজে নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া।”

এভাবে আমরা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, কুরআন-হাদীসের তাফসির, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ এবং নৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঈমানের গুরুত্ব, শর্ত ও স্বরূপের বিস্তারিত সাহিত্য পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছি।

## ১০. ঈমান ভঙ্গের কারণ: সাহিত্যিক ও নৈতিক বিশ্লেষণ

১০.১ অন্তর ও নৈতিক দুর্বলতা

সাহাবী যুগের আলেমরা যেমন ইমাম তাহাবী ও ইবনে কাসীর বলেছেন,

> “ঈমানের ভঙ্গের মূল কারণ হলো অন্তরের দুর্বলতা ও নৈতিক অশুদ্ধতা।”

অর্থাৎ, যদি হৃদয় আল্লাহ ও নবীজীর আদেশ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে মুখের স্বীকারোক্তি বা বাহ্যিক ইবাদতেও পূর্ণ ঈমান থাকে না।
গাজ্জালী বলেন —

> “যে ব্যক্তি অন্তরের ঈমানকে শক্ত রাখে না, তার কাজে স্থিরতা আসে না, এবং ফলে ঈমান ধীরে ধীরে দুর্বল হয়।”

১০.২ সামাজিক প্রভাব ও প্ররোচনা

মধ্যযুগের ইসলামী সাহিত্য থেকে জানা যায়, সমাজের প্ররোচনা ও ব্যর্থতা ঈমানের ক্ষতির বড় কারণ।

অবৈধ বন্ধুত্ব, মিথ্যা সংবাদ ও প্রলোভন হৃদয়ের ঈমান দুর্বল করে।

কুতুব উল্লেখ করেছেন, সমাজ যদি নৈতিকভাবে দূর্বল হয়, সেখানে ব্যক্তিগত ঈমানও ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

১০.৩ ধর্মীয় অনুশীলনে উদাসীনতা

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন,

> “নিয়মিত নামাজ, রোজা, জকাত ও কোরআন পাঠে অনিয়ম ঈমানকে দুর্বল করে।”

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষকরা দেখিয়েছেন,
যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ শিথিল, সেখানে যুব সমাজের ঈমানও ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়।

১০.৪ শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব

গাজ্জালী ও আধুনিক আলেমরা একমত যে, ইসলামী জ্ঞানহীনতা ঈমানের পতনের বড় কারণ।

কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা বোঝা না গেলে বিশ্বাস ঝুঁকিপূর্ণ হয়।

সাহাবীদের উদাহরণ দেখায়, যারা শিক্ষিত ও সচেতন ছিল, তাদের ঈমান দৃঢ় ও অটুট ছিল।

## ১১. সমাজে ঈমান ভঙ্গের প্রভাব

১১.১ নৈতিক অবক্ষয়

ঈমান দুর্বল হলে সমাজে নৈতিক মান কমে যায়।

মিথ্যা, দুর্নীতি ও অসদাচার বৃদ্ধি পায়।

সাহাবী যুগের উদাহরণ: যখন মুমিনরা সুদৃঢ় ছিল, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১১.২ সামাজিক অবিশ্বাস ও বিভাজন

ইবনে তাইমিয়্যার সাহিত্য অনুসারে, ঈমানের ক্ষয় সমাজে দ্বন্দ্ব, বিভাজন ও অসংহতি সৃষ্টি করে।

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব সামাজিক অস্থিরতা বাড়ায়।

## ১২. সাহাবীদের উদাহরণ

১২.১ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

তার দৃঢ় ঈমান ও নৈতিক মান সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সাহাবীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা, যে ব্যক্তি নিজে ঈমান রক্ষা করে, তার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে।

১২.২ উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তার ঈমান মূল চালিকা শক্তি ছিল।

তাফসির ও ইতিহাসে তিনি ঈমানের সামাজিক দায়িত্বের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

## ১৩. নবীজীর (সাঃ) দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের চর্চা

১৩.১ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব

নবীজী ﷺ বলেন —

> “যে ব্যক্তি ঈমান রক্ষা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও শান্তি দান করেন।”

এটি নির্দেশ করে, ঈমান শুধুই অন্তরের বিষয় নয়, বরং কর্ম ও দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত।

সাহাবীদের অনুশীলনই প্রমাণ করে, নবীজীর দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ঈমান ও সামাজিক নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক।

১৩.২ ঈমানের পরীক্ষা ও শিক্ষণীয় উদাহরণ

কুরআন ও হাদীসে নবীজীর সঙ্গী যারা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় ছিল।

উদাহরণ: ইয়াহুদা আযাবের কাহিনী, হযরত আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী।

শিক্ষা: পরীক্ষা হলো ঈমানের দৃঢ়তা যাচাইয়ের মাধ্যম।

১৪. আধুনিক সাহিত্য ও বাস্তব উদাহরণ

১৪.১ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক নৈতিকতায় অংশ নেয়, তাদের ঈমান দৃঢ় থাকে।

শিক্ষা ও সচেতনতা ছাড়া ব্যক্তিগত ঈমান ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

১৪.২ যুগোপযোগী প্রমাণ

শিক্ষিত ও নৈতিক পরিবারে ঈমান শক্তিশালী।

সামাজিক চাপে বা নৈতিক দুর্বলতায় যুব সমাজের ঈমান ক্ষয় হয়।

১৫. সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা

1. ঈমান কেবল অন্তর বা মুখের স্বীকৃতি নয় — এটি অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও কর্মের মিলন।
2. ঈমানের রক্ষা ও দৃঢ়তা শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত।

3. সাহাবী ও নবীজীর উদাহরণ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়  যে, ঈমান ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি।
4. ঈমান ভঙ্গের কারণ হলো অন্তর দুর্বলতা, ধর্মীয় উদাসীনতা, সামাজিক প্ররোচনা ও জ্ঞানহীনতা।
5. সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা দেখায়, ঈমান শুধু আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, এটি নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি।

## ৮।সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব

৮.২.১ নৈতিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

ঈমান মানুষকে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপস্থিতি এবং বিচারকে মনে রাখে, সে তার আচরণে সতর্ক থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব মুসলিম প্রতারণা বা অন্যায় থেকে বিরত থাকে, তার পেছনে ঈমানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোরআনে আল্লাহ বলেন:

> “সত্যবাদী ও ধার্মিকরা তাদের প্রতিশ্রুতিতে স্থির থাকে।” (সূরা আত্তাহরীম: ৮)

৮.২.২ সমাজে সংহতি ও সহযোগিতা
ঈমানী ব্যক্তি সাধারণত সমাজের কল্যাণে সক্রিয়। তারা সামাজিক ও মানবিক সহায়তায় অংশ নেয়। প্রাচীন ইসলামিক সমাজে, নবীজীর (সাঃ) যুগে সাহাবারা অসহায়দের সাহায্য করতেন, দু:স্থদের খাবার ও আশ্রয় দিতেন। এটি সমাজে সংহতি ও সমবায় মানসিকতা গড়ে তোলে।

যেমন,

হজরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ) খাদ্য বিতরণ করতেন

হজরত আলী (রাঃ) দুর্যোগের সময় জনগণকে সহায়তা করতেন।

৮.২.৩ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ

ঈমান মানুষের মনে নৈতিক বাধা সৃষ্টি করে। যারা ঈমান রাখে, তারা অপরাধ ও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকে। কোরআন নির্দেশ দেয়:

> "যারা আল্লাহকে মনে রাখে, আল্লাহ তাদের পথকে সহজ করে দেবেন।" (সূরা আনফাল: ২৯)
অর্থাৎ, ঈমান মানুষের মনে নৈতিক বাধা সৃষ্টি করে। অপরাধ ও অনৈতিক কাজের সংখ্যা কমে, সমাজে শান্তি বজায় থাকে।

৮.৩ নৈতিক দিক থেকে গুরুত্ব

৮.৩.১ চরিত্র গঠন

ঈমান মানুষের চরিত্রে নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করে। এটি সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য, সততা, দায়িত্ববোধ এবং সহমর্মিতাকে উৎসাহিত করে। ইসলামী দর্শনে ঈমান ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্মুখী নৈতিক উন্নয়নের মূল উপায়।

৮.৩.২ আত্মসংযম ও ধৈর্য

একজন ঈমানী ব্যক্তি প্রলোভন, চাপ বা কষ্টের সময়ও সংযমী থাকে। উদাহরণস্বরূপ,

নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার কঠোর পরিস্থিতিতে ধৈর্য দেখিয়েছেন

হজরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) প্রশাসনিক এবং সামাজিক সিদ্ধান্তে সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তার কঠোর নৈতিকতা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা দেয়।

৮.৩.৩ দায়িত্ব ও সততা

ঈমান একজন ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান করে। কোরআনে বলা হয়েছে:

> “প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের জন্য দায়ী।” (সূরা আল-ইসরা: ১৩)

সুতরাং, ঈমান ব্যক্তি ও সমাজে সততা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮.৪ বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব:
যে ছাত্ররা ঈমানী, তারা শিক্ষায় প্রতারণা বা অনৈতিক উপায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করে।

২. ব্যবসায় সততা:
ঈমানী ব্যবসায়ীরা নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ অনুসরণ করে। তারা প্রতারণা, বাণিজ্যিক দুর্নীতি বা অসৎ লেনদেন থেকে বিরত থাকে। এটি সমাজে বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

৩. সামাজিক সমস্যায় সহায়তা:
ঈমানী ব্যক্তি সমাজে সংকট ও দুর্যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে। এটি মানবিক সহমর্মিতা এবং সংহতি বাড়ায়।
৮.৫ সাহিত্য ও গবেষণার প্রমাণ

আধুনিক সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী, বিশ্বাস ও নৈতিকতার সংমিশ্রণ সমাজে সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

ইসলামী সাহিত্যও সমর্থন করে যে, ঈমান মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে।

ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায়, শক্তিশালী ঈমানযুক্ত সমাজগুলি অন্যায়, দারিদ্র্য ও সামাজিক দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় সফল হয়েছে।
৮.৬ বিশ্লেষণ

ঈমান কেবল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা নয়। এটি ব্যক্তি ও সমাজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অপরিহার্য। ইসলামী শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

উদাহরণ: সাহাবারা ও নবীজীর (সাঃ) যুগে সমাজে অসহায় ও দারিদ্র্য কমাতে ঈমানী ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

সমকালীন উদাহরণ: যেসব মুসলিম সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে সামাজিক সমস্যার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম।
সবশেষে বলা যায়,

ইমান ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে অব্যাহত প্রভাব ফেলে। এটি নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল ভিত্তি। একজন ব্যক্তি যিনি দৃঢ় ঈমান রাখেন, তিনি কেবল নিজের নৈতিক উন্নতি করেন না, বরং সমাজের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
ঈমান শক্তিশালী হলে সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।
সামাজিক সংঘাত, অপরাধ ও অসহযোগিতা কমে যায়।
সমাজে শান্তি, সংহতি ও নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা হয়।

## ৯: ঈমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মানবজীবনের মূলভিত্তি হলো বিশ্বাস বা আস্থা। কিন্তু সকল বিশ্বাসের মধ্যে যে বিশ্বাস মানুষকে আত্মিক শান্তি, নৈতিক দৃঢ়তা এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়, সেটিই হলো ঈমান। ইসলামী পরিভাষায় ঈমান এমন এক পরিপূর্ণ বিশ্বাসব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র অন্তরের অনুভূতি নয়, বরং চিন্তা, চরিত্র ও আচরণের সমন্বিত প্রকাশ। ঈমান মুসলমানের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু—এর উপরই নির্ভর করে তার ধর্মীয় পরিচয়, তার নৈতিকতা, এবং আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে ঈমানকে বলা হয় "মূল ভিত্তি" (أصل الدين)। যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, সে ইসলামের পথে প্রবেশ করে; আর যে ঈমান হারায়, সে পথচ্যুত হয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার বলেছেন—

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا

(সুরা নিসা আয়াত:১৩৬)

অর্থ,

হে মুমিনগণ! ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করে, সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

তাফসির ইবনে কাসির

মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শরীয়ত এবং ঈমানের সমুদয় শাখাকে যেন মেনে নেয়। এতে তাহসীলে হাসিল নেই, বরং রয়েছে তাকমীলে কামেল। অর্থাৎ যদি তারা ঈমান এনে থাকে তবে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে তবে তিনি তাদেরকে আরও যত কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছুর উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলমানের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ “আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন"-এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে স্বীয় সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِه অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' (৫৭:২৮)

وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى رَسُوْلِه এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ مِنْ قَبْل এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। কুরআন

কারীমের জন্য নালা এবং অন্যান্য কিতাবের জন্যে ‘আন্যালা’ ক্রিয়া ব্যবহার করার কারণ এই যে, কুরআন কারীম মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবসমূহ সমস্তই একই সাথে অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-যে কেউ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে সরে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

তাফসিরে আবু জাকারিয়া,

হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে [১] সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।

[১] কুফরী করার দুটি অর্থ হয়। (এক) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। (দুই) মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা অথবা নিজের মনের ভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিষটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি দু’টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।
আহসানুল বায়ানে,

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; [১] আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূরে চলে যায়।

[১] বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস করা ও ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার প্রতি তাকীদ করা, অর্জিত জিনিস অর্জন করার ব্যাপার নয়; বরং এই তাকীদের মাধ্যমে ঈমানকে পরিপূর্ণ করার এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন [اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ]

এর ভাবার্থ। (এ ছাড়া হাদীসে এসেছে যে, ঈমান পুরাতন হয় এবং তার নবায়নের জন্য দু'আ করতে হয়। সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৮৫নং)

এই আয়াতে লক্ষ্য করা যায়, ঈমান শুধু মুখের স্বীকৃতি নয়, বরং অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনও জরুরি। অর্থাৎ, ঈমান একটি জীবন্ত ও সক্রিয় ধারণা—যা মানুষের চিন্তা, ভাষা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়।

ঈমান শব্দের ভাষাগত ব্যাখ্যা

আরবি ভাষায় "ঈমান" শব্দটি এসেছে মূল ধাতু (أ م ن) থেকে, যার অর্থ নিরাপত্তা, শান্তি, বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা। 'আমানা', 'ইমান', 'আমানত', 'মু'মিন'—সব শব্দই এই মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত।

ভাষাগতভাবে 'ঈমান' মানে হলো বিশ্বাস করা, আস্থা রাখা, নিরাপত্তা অনুভব করা। তাই যখন কেউ বলে "আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি", তখন এর অর্থ হয়—"আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও তাঁর বিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই বিশ্বাসে নিজেদের আত্মাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় সমর্পণ করেছি।"

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে "ঈমান" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কখনো বিশ্বাস অর্থে, কখনো নিরাপত্তা অর্থে, আবার কখনো আস্থার প্রতীক হিসেবে। যেমন—

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

Al-An'am ৬:৮২

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ

অর্থ,

(প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌঁছে গেছে।

তাফসির ইবনে কাসির,

মহান আল্লাহ ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর সম্পর্কে বলছেন-যখন তিনি একত্ববাদ নিয়ে স্বীয় কওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছো? তিনি তো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের তৈরী এই মূর্তিগুলোর তো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি ওদেরকে ভয় করি না এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করি না। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তবে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যাঁ, আমার মহান প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। আমি যা কিছু বর্ণনা করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবে না? উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পূজা-অর্চনা থেকে বিরত থাকতে। তাদের সামনে এইসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হযরত হূদ (আঃ)-এর তাঁর কওমের সামনে এইসব দলীল পেশ করার ফলের মতই। এই আ'দ সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ - - - صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (১১:৫৩-৫৬) অর্থাৎ হযরত হূদ (আঃ)-এর কওমের লোকেরা তাকে বলেছিল, হে হূদ (আঃ)! আপনি তো আমাদের সামনে কোন মুজিযা পেশ করেননি, শুধু আপনার কথার উপর বিশ্বাস করেই কি আমরা আমাদের মা'বূদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? আমরা তো আপনার উপর ঈমান আনয়ন করবো না। আমরা তো মনে করছি যে, আমাদের মাবুদগুলোর পক্ষ থেকে আপনার উপর কোন লা'নত বর্ষিত হয়েছে। তখন হূদ (আঃ) বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছো, অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিয়ো না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী আছে সবারই ঝুটি তাঁরই মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে অবস্থিত।"

পরবর্তী আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি তুলে ধরা হয়েছে- আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করবো কেন? অথচ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা'রূদ বানিয়ে নিতে ভয় করছো না এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ ْاِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُم ُالله (৪২:২১) তিনি আর এক জায়গায় বলেছেনঃ (৫৩:২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে- তোমরাই বল তো যে, তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই মা'রূদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, না ঐ মা'বুদগুলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়?

এরপর ঘোষিত হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুলুম অর্থাৎ শিককে সংমিশ্রিত করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী তো জরাই এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। তারা ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করেছিল এবং সেই ইবাদতকে শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখেছিল। তাই দুনিয়া ও আখিরাত তাদেরই অধিকারে রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَ لَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ-এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কে এমন আছে যে নিজের নফসের উপর যুলুম করেনি?" তখন اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "নিশ্চয়ই শিকই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অত্যাচার।" (৩১:১৩)।

যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে নেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বুঝেছো তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লোকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুনিনি? তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ-اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ "হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করো না, নিশ্চয়ই তার সাথে শরীক স্থাপন করা হচ্ছে বড় অত্যাচার।" (৩১:১৩) এখানে যুলুম দ্বারা শিরুককে বুঝানো হয়েছে। (এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এই শব্দ দ্বারা তাখরীজ করেছেন)

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি ঐ ঈমানদার লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। আমরা যখন মদীনা হতে বাইরে চলে যাই তখন একজন উষ্ট্রারোহীকে আমাদের দিকে আসতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এই উষ্ট্রারোহী তোমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই আসছে।" যখন সে আমাদের কাছে পৌছে যায় তখন নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা থেকে আসছো?" সে উত্তরে বললোঃ "আমার পরিবারবর্গ ও গোত্রের নিকট থেকে আসছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "কোথায় যাবে?" সে জবাবে বললোঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, কি বলতে চাও বল, আমিই আল্লাহর রাসুল।" সে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা দান করুন।" তিনি বললেনঃ "তুমি সাক্ষ্য দান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'রূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। আর তুমি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে।" সে বললোঃ "আমি এগুলো স্বীকার করলাম।" বর্ণনাকারী বলেন যে, (সে ফিরে যেতে উদ্যত হলে) তার উটের সামনের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যায়। ফলে উটটি পড়ে যায় এবং সাথে সাথে লোকটিও পড়ে যায়। এই কারণে তার মাথা ফেটে যায় এবং গর্দান ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "লোকটির রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার দায়িত্ব।" সাথে সাথে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাঃ) দৌড়ে গিয়ে উঠালেন। তারপর তারা বলে উঠলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটির তো প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে!" একথা শুনে তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর তিনি তাদেরকে বলেনঃ "আমি লোকটির দিক থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তা কি তোমরা জান? (এর কারণ এই যে,) আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, দু'জন ফেরেশতা তার মুখে জান্নাতের ফল দিতে রয়েছেন। এর দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গেছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ এ লোকটি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরিককে সংমিশ্রিত করে না। তারপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের ভাইয়ের কাফন দাফনের ব্যবস্থা কর।" আমরা তখন তাকে গোসল দিলাম, কাফন পরালাম ও সুগন্ধি লাগালাম। অতঃপর তাকে কবরের দিকে বহন করে নিয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসলেন এবং কবরের ধারে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "বগলী কবর খনন কর, খোলা কবর করো

না। আমাদের কবর বগলীই হয়ে থাকে এবং অন্যদের জন্যে হয় ভোলা কবর। এই লোকটি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা অল্প আমল করে অধিক পুণ্য লাভ করে থাকে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক আমাদের সামনে এসে পড়ে এবং বলতে শুরু করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, আমি আমার দেশ, ছেলেমেয়ে এবং মালধন ছেড়ে আপনার নিকট এসেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার মাধ্যমে আমি হিদায়াত লাভ করবো। আমার অবস্থা এই যে, পথে শুধু ঘাস-পাতা খেয়ে আপনার কাছে পৌছেছি। এখন আপনি আমাকে দ্বীনের শিক্ষা দান করুন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন এবং সে তা কবুল করল। আমরা তার চারদিকে ভীড় জমালাম। সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। এমন সময় তার উটের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেল। তখন উটটি পড়ে গেল এবং ধাক্কা খেয়ে লোকটির ঘাড় ভেঙ্গে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কসম! লোকটি ঠিকই বলেছিল যে, দেশ ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে শুধুমাত্র হিদায়াত ও দ্বীন লাভের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আগমন করেছিল। সে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছে। আমি জানতে পারলাম যে, এই সফরে সে শুধু যমীনের ঘাস পাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। সে আমল করেছে অল্প কিন্তু পুণ্য লাভ করেছে অধিক। যারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরককে মিশ্রিত করেনি তারাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। তারাই প্রকৃত হিদায়াত প্রাপ্ত।' এই কথা যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এ লোকটি তাদেরই একজন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাখীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাকে দেয়া হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না দেয়া হলে ধৈর্যধারণ করে, কারও উপর যুলুম করলে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার উপর যুলুম করা হলে যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয়" -এ পর্যন্ত বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তার জন্যে কি রয়েছে?" তখন তিনি পাঠ করলেনঃ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْن অর্থাৎ এই লোকদের জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং এরাই হচ্ছে সুপথ প্রাপ্ত। (লুবাব গ্রন্থে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, একজন মুসলিম-শত্রু মুসলমানদের উপর আক্রমণ চলিয়ে পর পর তিনজনকে শহীদ করে দেয়। তারপর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ এখন আমার ইসলাম গ্রহণে কোন উপকার হবে কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ হ্যা।' তখন সে ঘোড়া চালিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর

তার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পর পর তিনজনকে হত্যা করে। কয়েকজন মনীষী মনে করেন যে, - - - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তারই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়)

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِه অর্থাৎ "এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম।" আল্লাহ পাকের এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেনঃ "তোমরা যখন কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় কর না, তখন আমি তোমাদের এই সব শক্তিহীন মাবুদকে ভয় করবো কেন? এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নেবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশী নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।" মহান আল্লাহ এটারই নাম দিয়েছেন শান্তি, নিরাপত্তা এবং হিদায়াত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ - - - اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا এবং এর পরে বলেছেনঃ وَ تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآء এখানে درجت শব্দটিকে اِضَافَت-এর সঙ্গেও পড়া হয়েছে এবং اِضَافَت ছাড়াও পড়া হয়েছে। দু'টোর অর্থ প্রায় একই। যেমন সূরায়ে يُوْسُف-এ রয়েছে।

اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْم অর্থাৎ "তিনি নিজের কথায় হাকীম বা প্রজ্ঞাময় এবং নিজের কাজে আলীম বা বিজ্ঞ।" (১২:৬) অর্থাৎ তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ نَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْم অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার প্রভুর কথা ও ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা সমস্ত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (১০:৯৬-৯৭)।

তাফসিরে আবু জাকারিয়া,

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম [১] (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য [২] এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

[১] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হচ্ছে- যুলুমের অর্থ শির্ক- সাধারণ গোনাহ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكرة ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শির্কই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوْا শব্দটি لَبْس থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোনো প্রকার শির্ক মিশ্রিত করে তার কোনো নিরাপত্তা নেই। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক বা মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শির্ক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোনো প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোনো ফিরিশতা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহর কোনো কোনো বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে বা আল্লাহকে যা দিয়ে ইবাদাত করা হয় তাদেরকে তেমন কিছু দিয়ে ইবাদাত করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা কোনো পীর, জ্বিন, ওলী বা মাযার ইত্যাদিকে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, আল্লাহর ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মুশরিক। তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতে শির্ক করল। অনুরূপভাবে যারা কবরবাসী, ওলী, মাযার, জ্বিন ইত্যাদিকে আহবান করে, সিজদা করে, সাহায্য চায়, মান্নত করে, তাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে তারা সবাই মুশরিক। তাদের নিরাপত্তা নেই। তারা আল্লাহর উলুহিয়াতে শির্ক করল এবং তাওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

[২] অর্থাৎ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, তারপর সে ঈমানের সাথে কোনোরূপ যুলুমকে মিশ্রিত করেনি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর যুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে যুলুম বলতে শির্ককে বোঝানো হয়েছে। দেখ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

(ۡاِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡم)

অর্থাৎ "নিশ্চিত শির্ক বিরাট যুলুম।" [বুখারী ৪৬২৯, ৬৯১৮] কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং তার ইবাদাতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে,

যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।[১]

[১] আয়াতে এখানে 'যুলম' বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যুলুমের সাধারণ অর্থ (অবজ্ঞা, ত্রুটি, পাপ এবং অত্যাচার ইত্যাদি) মনে করে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং রসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন, أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَه 'আমাদের মধ্যে এমন কেই বা আছে, যে যুলুম করেনি?' তখন রসূল (সাঃ) বললেন, "এ থেকে উদ্দেশ্য সে যুলুম নয়, যেটা তোমরা মনে করছ, বরং এ থেকে উদ্দেশ্য শিরক। যেমন, লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم} "অবশ্যই শিরক হল বড় যুলুম।" (সূরা লুকমান ৩১:১৩) (সহীহ বুখারীঃ তাফসীর সূরা আনআম)

এখানে স্পষ্ট, ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ হলো অন্তরের শান্তি ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার অবস্থা, যা মানুষকে ভয়, অস্থিরতা ও সংশয় থেকে মুক্তি দেয়।

শরীয়তসম্মত সংজ্ঞা (ইসলামী পরিভাষায় ঈমান)

ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদগণ ঈমানের সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, ঈমান তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—

১. অন্তরের বিশ্বাস (تصديق بالقلب) – আল্লাহ, নবী, ফেরেশতা, কিতাব, কিয়ামত এবং তাকদিরের প্রতি হৃদয়গত দৃঢ় বিশ্বাস।
২. মুখের স্বীকারোক্তি (إقرار باللسان) – ঈমানের ঘোষণা বা সাক্ষ্য প্রদান, যেমন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলা।
৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ (عمل بالجوارح) – ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে সৎকর্ম, ইবাদত ও নৈতিক আচরণ।

ইমাম আল-বুখারি (রহ.) বলেন—

> "ঈমান হলো কথা ও কাজ উভয়ই; এটি বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।"

এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, ঈমান একটি স্থির বা যান্ত্রিক অবস্থা নয়, বরং এটি বিকাশমান একটি গুণ, যা মানুষের নৈতিকতা, জ্ঞান ও কর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ঈমানের দার্শনিক স্বরূপ

দার্শনিক অর্থে ঈমান মানে হলো অদৃশ্য বাস্তবতায় বিশ্বাস, যা যুক্তি, জ্ঞান ও আত্মানুভূতির সংমিশ্রণে গঠিত। ইসলামী দর্শনে ঈমান কেবল ধর্মীয় ধারণা নয়; এটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান (epistemic state)—যেখানে মানুষ তার সীমিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এক অনন্ত সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করে।

আল-গাজ্জালী (রহ.) তাঁর "ইহইয়া উলূমুদ্দীন"-এ বলেছেন—

> "ঈমান হলো এমন একটি আলোকরশ্মি, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে স্থাপন করেন, যাতে সে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।"

অর্থাৎ ঈমান মানুষকে জ্ঞান দেয়, দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, এবং নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করে। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি, যা মানুষকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা ও করুণার পথে পরিচালিত করে।

অন্তরের অনুভূতি ও ঈমানের আত্মিক মাত্রা

ঈমানের সবচেয়ে গভীর দিক হলো এর আত্মিক ও অনুভূতিমূলক মাত্রা। শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মতি নয়, বরং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, ভয় ও নির্ভরতা—এগুলোই ঈমানের প্রকৃত আত্মা।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন—

> "ঈমানের মূল তিনটি: অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ।"

অন্তরের এই দৃঢ় বিশ্বাসই ঈমানের প্রাণ। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করে। যখন এই অনুভূতি দুর্বল হয়, তখন ঈমান কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়, যার কোনো আত্মিক প্রভাব থাকে না।

ঈমানের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

ঈমান একটি সামগ্রিক ও গতিশীল ধারণা। এটি কেবল ধর্মীয় আনুগত্য নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। ঈমানের মূল উপাদান তিনটি হলেও এর ভেতর নিহিত রয়েছে বহু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, যা ঈমানকে জীবন্ত ও শক্তিশালী রাখে।

১. আন্তরিক বিশ্বাস :

ঈমানের সূচনা হয় অন্তরের গভীরে। হৃদয়ে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও ন্যায্য বিধানের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়, তখনই প্রকৃত ঈমানের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। এই বিশ্বাস অদৃশ্য হলেও এর প্রভাব দৃশ্যমান হয় মানুষের নৈতিক আচরণ ও জীবনদর্শনে।

২. বাচনিক স্বীকৃতি :

ইসলাম ঈমানকে কেবল অনুভূতির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শাহাদাহ বা কালেমা তাই ঈমানের বাচনিক প্রতিফলন।

৩. কর্মের প্রতিফলন :

ঈমানের বাস্তবতা প্রমাণিত হয় কর্মে। নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ, দানশীলতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা—এসবই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

(সুরা বাকারা আয়াত:৮২)

অর্থ,

যেসব লোক ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।
তাফসির ইবনে কাসির,

ভাবার্থ এই যে, যার কর্ম সবই মন্দ, যার মধ্যে পুণ্যের লেশ মাত্র নেই সে দোযখী, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেছে সে জান্নাতবাসী। যেমন অন্যস্থানে আছেঃ "না তোমাদের কোন অভিসন্ধি চলবে, না আহলে কিতাবের। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে এবং তার জন্যে আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। আর মুমিন নর বা নারীর মধ্যে যারা ভাল কাজ করবে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের অর্থ কুফরী। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে শিক'। আবু অয়েল (রঃ), আকূল 'আলিয়া (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) কাতাদাহ (রঃ) এবং রাবী 'বিন আনাস (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও এটা বর্ণিত আছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, মন্দ কাজের অর্থ হচ্ছে কবিরা গুনাহ' যা স্তর স্তর হয়ে অন্তরের অবস্থা খারাপ করে দেয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ শিরক, যা অন্তরকে অধিকার করে বসে। হযরত রাবী' বিন খাসিম (রঃ)-এর মতে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পাপের অবস্থাতেই মরে এবং তাওবা করার সুযোগ লাভ করে না। মুসনাদ-ই-আহমাদে হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা পাপকে ছোট মনে করো না, এগুলো জমা হয়ে মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমরা কি দেখনা যে, কতকগুলো লোক একটি করে খড়ি নিয়ে আসলে খড়ির একটি স্তুপ হয়ে যায়। অতঃপর ওতে আগুন ধরিয়ে দিলে ওটা বড় বড় জিনিসকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়?" অতঃপর ঈমানদারগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা কুফরীর মুকাবিলায় ঈমান আনে এবং অসৎ কাজের মুকাবিলায় সকার্য করে, তাদের জন্যে চিরস্থায়ী আরাম ও শান্তি। তারা শান্তিদায়ক বেহেশতের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রদত্ত শান্তি ও শাস্তি উভয়ই চিরস্থায়ী।

তাফসির আবু জাকারিয়া,

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

তাফসির আহসানুল বায়ানে,

পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেছে (মু'মিন হয়েছে) এবং সৎকাজ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। [১]

[১] এখানে ইয়াহুদীদের দাবী খন্ডন ক'রে জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়ার মূলনীতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যার আমলনামায় কেবল পাপ আর পাপই থাকবে; অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক, (এই কুফরী ও শির্কীয় কর্ম সম্পাদনের কারণে তাদের অনেক ভাল কাজও কোন উপকারে আসবে না) সে তো চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে এবং যে ঈমান ও নেক আমলের ভূষণে ভূষিত হবে, সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে মু'মিন পাপী হবে, তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা শাস্তি স্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে রেখে নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এ কথা বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আহলে সুন্নাহর এটাই আক্বীদা ও বিশ্বাস।

এখানে ঈমান ও আমলের যুগল সম্পর্কই প্রকৃত ধর্মীয় পরিপূর্ণতার চিত্র তুলে ধরে।

ঈমানের বিকাশ ও অবক্ষয়ের ধারা

ঈমানের প্রকৃতি স্থির নয়; বরং এটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। হাদীসে বলা হয়েছে—

> "ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।" (ইমাম বুখারি)

বৃদ্ধির কারণ:

আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন পাঠ
সৎকর্ম ও ইবাদতে মনোযোগ
আল্লাহভীতি ও আত্মসমালোচনা
নৈতিক পরিবেশ ও সৎ সঙ্গ
হ্রাসের কারণ:
পাপাচার ও অবাধ জীবনযাপন
আত্মতুষ্টি ও অবহেলা
ভণ্ডামি ও দ্বিমুখিতা

সন্দেহ ও অজ্ঞতা

এই ওঠানামার মাধ্যমে বোঝা যায় যে ঈমান একটি আত্মিক শক্তি—যা যত বেশি চর্চা করা হয়, ততই দৃঢ় হয়; আর অবহেলায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ইসলামী শিক্ষায় ঈমান রক্ষার জন্য নিয়মিত ইবাদত, আত্মবিশ্লেষণ ও নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

ইতিহাসে ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশের সাথে সাথে ঈমানের সংজ্ঞা নিয়েও বিভিন্ন মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রধানত চারটি প্রবণতা উল্লেখযোগ্য—

১. খারেজি মতবাদ:

খারেজিরা মনে করত, ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস নয়, বরং কর্মও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে, কেউ যদি বড় গুনাহ করে, তবে সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় এবং কাফের হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অতিরিক্ত কঠোর ও বহিষ্কৃতিমূলক ছিল।

২. মুরজিয়া মতবাদ:

মুরজিয়ারা খারেজিদের বিপরীত অবস্থান নেয়। তারা বলত, ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি। আমল (কর্ম) ঈমানের অংশ নয়। তাই পাপ করলেও কেউ ঈমানদার থাকতে পারে, যতক্ষণ সে অন্তরে বিশ্বাস রাখে। এ মতবাদ কিছুটা শিথিল ও নৈতিক উদাসীনতার দিকে ঝুঁকে যায়।

৩. আশআরী ও মাতুরিদী মতবাদ:

এই দুটি সুন্নি ধর্মতত্ত্বীয় ধারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তাদের মতে, ঈমান মূলত অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, তবে আমল তার পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। তারা বলেন, গুনাহের কারণে ঈমান দুর্বল হয় কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না।

৪. সালাফি বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত দৃষ্টিভঙ্গি:

এই দৃষ্টিতে ঈমান হলো কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমন্বিত রূপ। ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, এবং আমল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের সরল ব্যাখ্যার ওপর জোর দেন।

ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (চরিত্রগত দিক থেকে)

১. স্থিতিশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা: ঈমানদার ব্যক্তি অটল থাকে, পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার নীতি বদলায় না।
২. নৈতিক শুদ্ধতা: ঈমান মানুষকে অন্যায়, মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে বিরত রাখে।
৩. আত্মিক শান্তি: ঈমান আল্লাহর প্রতি আস্থা এনে মনকে প্রশান্ত করে।
৪. সামাজিক দায়িত্ববোধ: ঈমানদার সমাজকল্যাণে কাজ করে, কারণ সে জানে সৃষ্টিকে সেবা করা স্রষ্টারই নির্দেশ।
৫. পরকালীন সচেতনতা: ঈমান মানুষকে জবাবদিহির চেতনায় রাখে, ফলে সে দায়িত্বশীলভাবে জীবনযাপন করে।
ঈমান ও যুক্তির সম্পর্ক

অনেকে মনে করেন ঈমান মানে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু ইসলাম ঈমানকে যুক্তির পরিপূরক হিসেবে দেখে। কুরআন বারবার মানুষকে চিন্তা, পর্যালোচনা ও উপলব্ধির আহ্বান জানিয়েছে। ঈমান এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, যা যুক্তিকে আলোকিত করে; যুক্তি এমন এক পথ, যা ঈমানের সত্যতায় পৌঁছাতে সহায়তা করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ وَأَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ

(সুরা আরাফ আয়াত:১৮৫)

অর্থ,
তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বে এবং আল্লাহ যে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় কাছেই এসে পড়েছে? সুতরাং এর পর আর কোন কথায় তারা ঈমান আনবে?

তাফসির ইবনে কাসির,

ইরশাদ হচ্ছে। আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা একথা কি চিন্তা করে দেখে না যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে। সবগুলোর উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করতো যে, এ সবকিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন। তাঁর সাথে কারো কোন তুলনা চলে না এবং তার সাথে কারো কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তাদের আরো উচিত তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, প্রতিমাগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরীর অবস্থাতেই মৃত্যু এসে পড়ে তবে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে? অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা মুহাম্মাদ (সঃ) পেশ করেছেন, তবে তারা আর কোন কথার সত্যতা স্বীকার করবে?

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শবে মিরাজে গিয়ে যখন আমি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছলাম তখন উপর দিকে তাকিয়ে বস্ত্র ও বিদ্যুৎ দেখতে পেলাম এবং এমন কতগুলো লোকের পার্শ্ব দিয়ে আমি গমন করলাম যাদের পেট মৃৎ পাত্রের মত ফুলে মোটা হয়েছিল। পেটের মধ্যে সাপ ভরা ছিল। বাইরে থেকেও সেই সাপ দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এরা হচ্ছে সুদখোর।" অতঃপর এই প্রথম আকাশে নেমে এসে নীচের দিকে তাকালে ধুয়ার মত দেখলাম এবং শোরগোল শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "এরা হচ্ছে শয়তান, যারা মানুষের চোখের সামনে ঘুরতে থাকে এবং আড় হয়ে যায়, যেন মানুষ যমীন ও আসমানের আধ্যাত্মিক বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাতই করতে না পারে। যদি এই প্রতিবন্ধকতা থাকতো তবে মানুষ আকাশের বহু বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেতো।"

এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলী ইবনে যায়েদ। বহু মুনকার হাদীসের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে।

তাফসির আবু জাকারিয়া,

তারা কি লক্ষ্য করে না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে? [১] আর এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গিয়েছে, কাজেই এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

[১] অর্থাৎ আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তারা কি আসমান ও যমীনে আল্লাহর রাজত্ব ও ক্ষমতা, এতদুভয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে না? তাহলে তারা এর মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারত যে, এগুলো একমাত্র সে সত্ত্বার জন্য যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, নেই কোনো সমকক্ষ, ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনত, তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মানত। তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসত। তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবতীয় শরীক ও মূর্তি থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করত। তাছাড়া তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হতো যে, এভাবে তাদের জীবনের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে, তখন যদি কুফরি অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় তবে তাদের স্থান হবে আল্লাহর আযাবেই। [ইবন কাসীর]

তাফসির আহসানুল বায়ানে,

তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, তাদের (মরণের) নির্ধারিতকাল সম্ভবতঃ নিকটবর্তী হয়ে গেছে।[১] সুতরাং এর পর তারা আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে? [২]

[১] অর্থাৎ, এই সকল জিনিস নিয়েও যদি তারা চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহর উপর ঈমান আনত, তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত ও তাঁর অনুসরণ করত, তারা যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তা ত্যাগ করত এবং এ ব্যাপারে ভয় করত যে, তাদের মৃত্যু যেন তাদের কুফরীর অবস্থায় থাকাকালীন না আসে।

[২] حديث (কথা বা বাণী) বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং কুরআন মাজীদ (পড়া বা শোনার) পরও যদি তারা ঈমান

না আনে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আর কি হতে পারে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হলে তারা ঈমান আনবে।

এই আয়াত প্রমাণ করে, ঈমান ও চিন্তা পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরিপূরক।

ঈমানের নৈতিক স্বরূপ

নৈতিকতার সঙ্গে ঈমানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃত ঈমান ছাড়া নৈতিকতা টেকসই হয় না, আর নৈতিকতা ছাড়া ঈমানের প্রভাবও থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—

> "যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে মুমিন নয়।" (সহিহ বুখারি)

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ঈমানের সত্যতা কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে নয়, বরং মানুষের প্রতি দায়িত্বপূর্ণ আচরণেও প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং,ঈমান এমন এক অভ্যন্তরীণ শক্তি, যা মানুষকে আত্মিক পরিশুদ্ধি, নৈতিক দৃঢ়তা ও সামাজিক ভারসাম্যে নিয়ে আসে। এর সংজ্ঞা কেবল বিশ্বাস নয়—বরং বিশ্বাস, বাচনিক স্বীকৃতি ও নৈতিক কর্মের এক জীবন্ত মিশ্রণ। বিভিন্ন মতবাদে পার্থক্য থাকলেও মূল ঐকমত্য এই যে, ঈমান ছাড়া ইসলামী জীবন অসম্পূর্ণ।

ঈমানের স্বরূপ বোঝা মানে হলো—মানবসত্তার অভ্যন্তরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভালোবাসা ও নৈতিক দায়বদ্ধতার এক সুষম সমন্বয় অনুভব করা।

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ঈমান ও আমল (কর্ম) একে অপরের পরিপূরক। ঈমান হলো অন্তরের আলো, আর আমল সেই আলোর বাস্তব প্রকাশ। যদি ঈমান অন্তরে স্থাপিত হয় কিন্তু কর্মে প্রতিফলিত না হয়, তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আবার শুধুমাত্র বাহ্যিক কাজ, যার ভিতরে ঈমানের শক্তি নেই, তা আত্মাহীন দেহের মতো।

কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঈমান ও আমল একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا

(সুরা কাহফ আয়াত:৩০)

অর্থ,

তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা নিশ্চিত থাকুক, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।

তাফসিরে আবু জাকারিয়া,

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে--- আমরা তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না- যে উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করেছে।
তাফসিরে আহসানুল বায়ানে,
যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। [১]

[১] কুরআনের বর্ণনা-রীতি অনুযায়ী জাহান্নামীদের পর জান্নাতীদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাত লাভের প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

لِّيُدۡخِلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوۡزًا عَظِيمًا

(সুরা ফাতাহ আয়াত:৫)

অর্থ,

যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে প্রবহমান রয়েছে নহর, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং যাতে তাদের থেকে মিটিয়ে দেন তাদের মন্দসমূহ। আল্লাহর কাছে এটাই মহাসাফল্য।

যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন; আর এটাই হলো আল্লাহর নিকট মহাসাফল্য।
তাফসিরে আহসানুল বায়ানে,

এটা এ জন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে[১] যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপরাশি মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য
এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ঈমান ও আমল কখনো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমল ঈমানের দৃঢ়তার সাক্ষ্য দেয়, আর ঈমান আমলের অনুপ্রেরণা জোগায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> “মানুষের দেহে একটি অঙ্গ আছে; সেটি ভালো হলে পুরো দেহ ভালো হয়, আর সেটি নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়। সেটি হলো হৃদয়।” (সহিহ বুখারি)

অর্থাৎ, হৃদয়ে ঈমান সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রতিফলন মানুষের কাজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঈমানের বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন

প্রকৃত ঈমান কেবল উপাসনালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবনের প্রতিটি স্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন তুলে ধরা হলো—

১. ব্যক্তিগত জীবনে:

ঈমান একজন মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। একজন মুমিন জানে, আল্লাহ সব কিছু দেখছেন; তাই সে গোপনে ও প্রকাশ্যে সৎ থাকে, অন্যায়ের বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ—কোনো কর্মচারী যদি ঈমানদার হয়, তবে সে একা অফিসে থেকেও ঘুষ গ্রহণ করবে না, কারণ তার অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত।

২. পারিবারিক জীবনে:

ঈমান পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করে। দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন—এসবই ঈমানের বাস্তব ফল।
কুরআনে বলা হয়েছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

(সুরা আত-তাহরীম আয়াত:৬)

অর্থ,

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।

তাফসিরে আবু জাকারিয়া,

হে ইমানদারগণ [১]! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে [২], যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম,

কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে।

[১] এই আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোনো শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম যাবানিয়া'। এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোনো মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দেয়াও তার কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল বা দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা, তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।" [বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮]

[২] এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়েছে, সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহ ঐ মহিলাকেও রহমত করুন যে, নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকে জাগিয়েছে, যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।" [আবু দাউদ ১৪৫০, ইবন মাজহ ১৩৩৬]

হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্য সাত বছর বয়সে পৌছলেই নির্দেশ দাও, আর তাদেরকে দশ বছর হলে এর জন্য দণ্ড দাও। আর তাদের শোয়ার জায়গা পৃথক করে দাও। [আবু দাউদ ৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮০] অনুরূপভাবে পরিবার পরিজনকে সালাতের

সময়, সাওমের সময় হলে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বিতর পড়তেন তখনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে ডাকতেন এবং বলতেন, “হে আয়েশা! দাঁড়াও এবং বিতর আদায় কর।” [সহীহ মুসলিম ৭৪৪, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৫২]
তাফসিরে আহসানুল বায়ানে,

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, [১] যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।

[১] এতে মু'মিনদের পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হল, নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়ত দেওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। যাতে তারা জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আর এই কারণেই রসূল (সাঃ) বলেছেন, "শিশুরা যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর (তারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হলে) তাদেরকে (শিক্ষামূলক) প্রহার কর।" (সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে তিরমিযী নামায অধ্যায়) ফক্বীহগণ বলেন, এইভাবে তাদেরকে রোযা রাখারও আদেশ দিতে হবে এবং অন্যান্য শরীয়তী বিধি-বিধানের অনুসরণ করার শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে। যাতে সাবালক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সত্য দ্বীন মানার অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়। (ইবনে কাসীর)
এই আয়াতের অন্তর্নিহিত বার্তা হলো, ঈমান কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি পারিবারিক দায়িত্ব ও সমাজগঠনের উপাদান। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন জাহান্নাম থেকে নিজে বাচতে তার আপনজনদের বাচাতে এটা তার ইমানি দায়িত্ব।

৩. সামাজিক জীবনে:

একটি সমাজের নৈতিক ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমানদার সমাজে প্রতারণা, শোষণ, অন্যায় বা দুর্নীতি টিকতে পারে না।
হযরত উমর (রাঃ) বলেন—

> “যে সমাজে ঈমান আছে, সেখানে আইন কঠোর না হলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।”

অর্থাৎ, ঈমান সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে।

৪. অর্থনৈতিক জীবনে:

ঈমানদার ব্যক্তি অর্থ উপার্জনে হালাল–হারামের পার্থক্য বুঝে চলে। ব্যবসায় সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা তার ঈমানেরই অংশ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> “সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সত্যবাদী ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।” (তিরমিজি)

৫. রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পরিসরে:

যখন নেতারা ঈমানের আলোয় পরিচালিত হন, তখন ন্যায়, মানবিকতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ইতিহাসে নবী ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন যুগই তার উজ্জ্বল উদাহরণ—যেখানে ঈমানই ছিল রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্র।

ঈমানের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য

ঈমান মানুষকে নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলে। এটি অন্যের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা শেখায়। একজন ঈমানদার কখনো সমাজবিরোধী বা অমানবিক কাজ করতে পারে না।

> “মুমিন তো একে অপরের ভাই।” (সূরা আল-হুজরাত: ১০)

এই আয়াত ইসলামী সমাজের সামাজিক চেতনার ভিত্তি স্থাপন করে। সমাজে ঈমান থাকলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার টিকে থাকে।

নৈতিক দিক থেকে ঈমান মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়। ঈমান ছাড়া নৈতিকতা কেবল সামাজিক রীতি; কিন্তু ঈমানের সঙ্গে যুক্ত হলে তা পরিণত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক মহান নৈতিক অঙ্গীকারে।

দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানবমনের গভীরে এক স্থায়ী বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা থাকে—যা তাকে স্থিরতা, আশা ও আত্মবিশ্বাস দেয়। ঈমান সেই চাহিদা পূরণ করে। এটি মানুষকে হতাশা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

দার্শনিকভাবে বলা যায়, ঈমান এমন এক transcendent conviction যা মানুষকে সীমিত বাস্তবতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অনন্ত সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে।
মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঈমান মানে আত্মিক নিরাপত্তা (spiritual security)—যেখানে মানুষ জানে, তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ এক মহান সত্তার হাতে। এ বিশ্বাসই মানুষকে ভয়, উদ্বেগ ও শূন্যতা থেকে মুক্তি দেয়।

ঈমানের শক্তি ও টেকসইতা

ঈমান যত গভীর হয়, ততই মানুষ চ্যালেঞ্জের মুখে দৃঢ় থাকে। দুঃখ, ভয়, বিপদ—কোনো কিছুই তাকে টলাতে পারে না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—

> “যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তারা অবিচল থাকে—তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।” (সূরা আহকাফ: ১৩)

এই অবিচলতা (ইস্তিকামাহ) ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ। এটি মানুষকে ধৈর্যশীল, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে।
সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ঈমানের প্রাসঙ্গিকতা

আজকের যুগে প্রযুক্তি, বস্তুবাদ ও নৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে মানুষ আত্মিক শূন্যতায় ভুগছে। ঈমানই সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে। ঈমান মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> "তুমি একা নও; তোমার স্রষ্টা তোমার সঙ্গে আছেন।"

এই উপলব্ধিই আধুনিক মানবতার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।
যেখানে ঈমান দুর্বল, সেখানে স্বার্থপরতা, অবিচার ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঈমানের শক্তি থাকলে মানুষ নিজের সীমা জানে, অন্যের অধিকার সম্মান করে এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ঈমান ইসলাম ধর্মের প্রাণ, মানুষের জীবনের কেন্দ্র ও নৈতিকতার উৎস। এর সংজ্ঞা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়—বরং অন্তরের দৃঢ় আস্থা, মুখের স্বীকৃতি ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ।

ঈমান মানুষকে করে তোলে সৎ, সাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্তিপ্রিয়। এটি শুধু আখিরাতের মুক্তির উপায় নয়, বরং পার্থিব জীবনেরও শৃঙ্খলা, ন্যায় ও মানবিকতার ভিত্তি।

একজন প্রকৃত মুমিন হলো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর আল্লাহর প্রতি অটল, যার মুখে সত্য, আর যার কাজে ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিফলিত হয়।

> "মুমিনেরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে মনোযোগী, যারা অর্থহীন কথা থেকে বিরত থাকে, যারা জাকাত প্রদান করে এবং যারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত রাখে।"
(সূরা আল-মুমিনুন: ১–৫)

এই আয়াতেই ঈমানের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও জীবনদর্শন একত্রে প্রকাশ পেয়েছে—অন্তরের বিশ্বাস, আচরণের সংযম, সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক শুদ্ধতা।

সুতরাং, ঈমান কেবল একটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়—এটি মানব জীবনের দিকনির্দেশনা, সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোচ্চ মাধ্যম।

### ১০: ঈমানের মৌলিক শর্তসমূহ:

ঈমান ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি। কিন্তু এই ঈমান তখনই পরিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক শর্ত পূরণ করে। ইসলামী শরীয়তে ঈমানকে শুধু "বিশ্বাস" হিসেবে নয়,

বরং “দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও কর্মপ্রতিফলনসহ বিশ্বাস” হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই আলেমগণ বলেছেন —

> “ঈমান এমন এক বাস্তব অবস্থা, যা অন্তরের স্বীকৃতি, মুখের উচ্চারণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।”

ঈমানের এই পরিপূর্ণতার জন্য যে বিষয়গুলো অপরিহার্য, সেগুলোকেই ইসলামী ধর্মতত্ত্বে ঈমানের মৌলিক শর্ত বলা হয়। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে ঈমান অসম্পূর্ণ থাকে, এবং কোনো ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে “মুমিন” বলা যায় না।

ঈমানের মৌলিক শর্তসমূহের সারসংক্ষেপ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসব্যবস্থা ছয়টি মূল স্তম্ভ বা “আরকানুল ঈমান” (أركان الإيمان) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আঃ)-এর বিখ্যাত হাদীসে বলেন—

> “ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, পরকাল (আখিরাত)-এর প্রতি এবং তাকদিরের ভালো-মন্দ উভয়ের প্রতি।”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ৮)

এই ছয়টি বিশ্বাস-অঙ্গই ঈমানের মৌলিক শর্ত। নিচে প্রতিটি শর্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো।

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান

এটি ঈমানের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1). اللَّهُ الصَّمَدُ (2). لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3). وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاَ أحد(4)

"

অর্থ,

> “বল, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেননি, জন্মগ্রহণও করেননি; এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।”
(সূরা ইখলাস)

আল্লাহর প্রতি ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন

وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

“আর মুমিনরা প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে।” (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)। আরও বলা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখো।' (সূরা আন নিসা : ১৩৬)

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে[১] আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله

“যতক্ষণ মানুষ এ সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীকার করে নেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই’ সে আমার থেকে তার জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল। তবে শরীআহসম্মত কোনো কারণ ঘটলে তা ভিন্ন কথা। আর তার (কৃতকর্মের) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।”

উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলন করা হয়েছে। তাতে নবী করীম (সা.) বলেছেন

مَن ماتَ وهو يَعْلَمُ أنَّه لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ

“যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[২]

[১].ইমাম বুখারী যাকাত অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ঈমান অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[২]. সহীহু মুসলিম, 'যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতী অনুচ্ছেদ, ঈমান অধ্যায়।

বিশ্বাসের উপাদান:

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

তাঁর একত্বে (তাওহীদে) দৃঢ় বিশ্বাস

তাঁর সব গুণাবলির প্রতি আস্থা

তাঁর ইচ্ছা, আদেশ ও বিধানের প্রতি আনুগত্য

ব্যাখ্যা:
আল্লাহর প্রতি ঈমান মানে কেবল তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার নয়, বরং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এটি এক আধ্যাত্মিক অঙ্গীকার, যা মানুষকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে নিয়ে যায়।

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি, যারা আলো থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তারা পাপহীন, আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নিরন্তর কাজ করেন।

কুরআনের প্রমাণ:

> “রাসূল বিশ্বাস রেখেছেন যা তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং মুমিনরাও তাই করেছে। সবাই বিশ্বাস রেখেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি।”
(সূরা আল-বাকারা: ২৮৫)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান মানে:

তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা

তারা আল্লাহর বার্তা ও কাজ সম্পাদন করে—এটা স্বীকার করা

তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখা

তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হিসেবে মানা

প্রধান ফেরেশতাদের নাম ও দায়িত্ব:

জিবরাঈল (আঃ): ওহি বা বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বে।

মিকাঈল (আঃ): বৃষ্টি ও জীবিকার বন্টন পরিচালনা করেন।

ইসরা’ফিল (আঃ): কিয়ামতের শিঙ্গা ফুঁকবেন।

আজরাঈল (আঃ): মৃত্যুর সময় প্রাণ সংগ্রহ করেন।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য বিভিন্ন যুগে নবীদের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন।

প্রধান কিতাবসমূহ:
১. তাওরাত – হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি
২. যাবুর – হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি
৩. ইঞ্জিল – হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি
৪. কুরআন – হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি

কুরআনের প্রমাণ:

> “আমি পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপরও কিতাব নাযিল করেছি, আর মুহাম্মদের প্রতি নাযিল করেছি সত্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, যাতে তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সমর্থন করেন এবং সংরক্ষণ করেন।”
(সূরা আল-মায়িদা: ৪৮)

বিশ্বাসের সারমর্ম:

সব কিতাবই আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল।

কুরআন সর্বশেষ, পরিপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় কিতাব।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলো সত্য ছিল, তবে পরবর্তীতে বিকৃত হয়েছে।

কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা মানে এর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহর বার্তা মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষকেই সঠিক পথে আহ্বান করেছেন।

প্রমাণ:

> "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো।"
(সূরা আন-নাহল: ৩৬)

বিশ্বাসের দিক:

প্রত্যেক রাসূল সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভুল।

তারা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।

তাদের প্রতি অসম্মান করা ঈমানের পরিপন্থী।

সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ – তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ঈমানের অর্থ:
তাঁকে ভালোবাসা, অনুসরণ করা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, এবং তাঁর শিক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَا عَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
"যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।"

(সুরা নিসা আয়াত :৮০)

নবী-রাসূল, ফেরেশতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা নিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন

وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

‘এবং সকল মুমিন— আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ এবং নবীদের উপর ঈমান আনে।[১]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- যা হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত সেখানে জিবরীল (আঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে

الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

“ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর তোমার ঈমান আনয়ন।[২]

কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে আল-কুরআনের উপর ঈমান আনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং সেই কিতাবের (কুরআনের) প্রতিও যা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, সেই সাথে আগে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলোর প্রতিও।[৩]

[১]. সূরা আল-বাকারা : ২৮৫।

[২]. হাদীসটি সহীহ আল-বুখারীতে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এবং সহীহ মুসলিম উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পুরো হাদীসটি নিম্নরূপঃ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে ছিলাম। একজন লোক এলেন। তার পরনের কাপড় ছিলো সাদা ধবধবে, মাথার চুলগুলো ছিলো কাল কুচকুচে। তিনি অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন, দেখে এমন মনে হলো না, কিন্তু

আমরা কেউ তাকে চিনলাম না। এসে নিজের হাঁটুদ্বয় নবী করীম (সা.)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন। দুহাত নবী করীম (সা.)-এর উরুর উপর রাখলেন। তারপর বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- ইসলাম হলো তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম, কী আশ্চর্য! প্রশ্নও করছেন আবার সত্যায়িতও করছেন। তারপর বললেনআমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ঈমান হচ্ছে- তুমি আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ব্যাপারে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন- আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন- আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। নবী করীম (সা.) বললেন, ইহসান হচ্ছে- তুমি আল্লাহকে দেখছে এই অনুভূতি নিয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করবে। যদি তাকে নাও দেখ মনে করবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। এবার আগন্তুক বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি (উত্তরদাতা) বেশী কিছু জানেন না।

তিনি বললেন, আমাকে এর কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। খালি পা উদাম গা এরূপ দরিদ্র মেষের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখতে পাবে। আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমিও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- উমার! তুমি কি জাননা প্রশ্নকারী কে? বললাম- আল্লাহ ও তার রাসূলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। নবী করীম (সা.) বললেন, তিনি জিবরীল, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন। (সহীহ মুসলিম)।

[৩]. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৬।

৫. আখিরাত বা পরকাল বিশ্বাস

ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

অর্থ:
এই পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী; মৃত্যুর পর শুরু হবে চিরন্তন জীবন। সেখানে প্রতিটি কাজের হিসাব হবে এবং তার ওপর নির্ভর করবে জান্নাত বা জাহান্নামে গমন।

প্রমাণ:

> “যে কণামাত্র সৎকর্ম করবে, সে তা দেখবে; আর যে কণামাত্র অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখবে।”
(সূরা আয-যিলযাল: ৭–৮)

বিশ্বাসের মূল দিক:

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী সত্য।

মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব আছে।

জান্নাত ও জাহান্নাম বাস্তব।

প্রতিটি মানুষ তার কাজের জবাবদিহি করবে।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল, সতর্ক ও ন্যায়পরায়ণ করে তোলে।

আখিরাত বা পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অংশ। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

‘তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।”[১]

হুলাইমী[২] বলেন, অবশ্যই একদিন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। একদিন একদিন করে মূলত পৃথিবী সেই দিনটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যা হঠাৎ করে এসে হাজির হবে। সেই দিনটিকে পাশ কাটানোর কোনো উপায়ই নেই। সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন- যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। দোকানদার ও খরিদ্দার কাপড় দর দাম করে মূল্য পরিশোধের আগেই তা সংঘটিত হয়ে যাবে।'[৩]

[১]. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ২৯।

[২]. পুরো নাম আল হসাইন ইবনু আল হাসান হুলাইমী (হি-৩৩৮-৪০৩)। শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। ইমাম বাইহাকীর শিক্ষক। তার অন্যতম গবেষণা হচ্ছে 'আল মিনহাজ ফী শুআবুল ঈমান'। ইমাম বাইহাকী এই গ্রন্থটির অনুকরণেই শুআবুল ঈমান' গ্রন্থটি রচনা করেন। টীকা- ইমাম কাযভিনী।

[৩]. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৬. তাকদির (ভালো ও মন্দ ভাগ্য) এর প্রতি ঈমান

তাকদির মানে আল্লাহ তাআলার পূর্বনির্ধারণ। সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতায় এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন।

প্রমাণ:

> "নিশ্চয় আমি সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল-কামার: ৪৯)
বিশ্বাসের সারমর্ম:

আল্লাহ সব কিছু জানেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

যা ঘটবে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই ঘটে।

মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত।

তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে হতাশা থেকে মুক্ত করে এবং ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার চেতনা জাগায়।

> "বল, কখনোই আমাদের ক্ষতি বা লাভ হবে না, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন তা-ই ঘটবে; তিনি আমাদের রক্ষক।" (সূরা আত-তাওবা: ৫১)

ভালো হোক কিংবা মন্দ, সবকিছুই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এ কথার উপর ঈমান রাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

বলুন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

(সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৮)

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- (নবী করীম সা. বলেছেন) একবার আদম (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিলো। মূসা (আঃ) বললেন- হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। আদম (আঃ) বললেন- আপনি তো মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। লিখিত কিতাব (তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর বিতর্কে বিজয়ী হলেন।
হাদীসটি সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাকদীর অধ্যায়ে 'আদম ও মূসা-এর বিতর্ক শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুনাইদ ইবনু আহমদ আতাবারী থেকে বর্ণনা পরম্পরায় আবু বকর আল বাইহাকী নিম্নোক্ত কবিতাটি জানতে পেরেছেন।

নিয়তি নির্ধারিত বলে স্রষ্টার প্রতি

মানুষের কত না অভিযোগ,

সময়ের পরিবর্তনে সবকিছুই যাবে হারিয়ে

রবে না কোনোই সুযোগ।

ভালো মন্দ রিযিক দৌলত সবকিছু সে তো

মহান স্রষ্টারই হাত

তবু নিন্দুকেরা কেবল তারই নিন্দা করে।

চলছে দিন রাত।

ঈমানের শর্তসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

ঈমানের ছয়টি মৌলিক শর্ত (আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত ও তাকদির) আলাদা হলেও একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া অন্য শর্তগুলো পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান কেবল আল্লাহর নির্দেশ বোঝার মাধ্যমে কার্যকর।

আখিরাত ও তাকদিরের বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর প্রতি স্থিরতা, ধৈর্য ও আস্থা দিতে সহায়তা করে।

সুতরাং, এই ছয়টি শর্ত একত্রে ঈমানের পূর্ণতা নিশ্চিত করে।

ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের উপায়

1. হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন:

শুধু মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়; অন্তরের গভীরে ঈমান দৃঢ় থাকতে হবে।

2. মুখে স্বীকৃতি প্রদান (কওলামুল ঈমান):

মুমিন তার বিশ্বাসকে উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন: শাহাদাত পাঠ করা।

3. কর্মে প্রকাশ (আমালুল ঈমান):

ঈমান কেবল অন্তরে নয়; এটি কর্মে প্রমাণিত হতে হবে—নামাজ, রোজা, জাকাত, নৈতিক আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে।

4. অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জন:

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ঈমানকে জানাশোনা ও বোঝার চেষ্টা করা।

5. ধৈর্য ও ধ্যান:

জীবনের পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধৈর্য রাখা। বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখা।

আলেমদের ব্যাখ্যা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

বিখ্যাত ইসলামী আলেমগণ যেমন ইমাম গযালি, ইমাম ইবনে তয়মিয়া ও ইমাম সুয়ুতি ঈমানের মৌলিক শর্তসমূহকে তিনটি দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন—

1. ইনসাফ ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ:

ঈমান শুধুমাত্র আবেগ বা অনুকরণ নয়; এটি যুক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস।

2. আন্তরিকতা ও স্বচ্ছন্দতা:

বিশ্বাস হতে হবে আন্তরিক; যাতে হৃদয় এবং আচরণ উভয়ই একমুখী হয়।

3. সমাজ ও নৈতিকতার ভিত্তি:

ঈমান সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিকতা নিশ্চিত করে। আলেমদের মতে, একজন ব্যক্তি যদি ঈমানের শর্ত পূরণ করে, তবে তার আচরণ ন্যায়পরায়ণ ও দয়া-শীল হয়।

ঈমানের পূর্ণতার চিহ্নসমূহ

1. নির্ভরযোগ্যতা ও সততা:

ঈমানদার ব্যক্তি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকে।

2. ধৈর্য ও সংকল্প:

বিপদ ও কষ্টে তিনি অবিচল থাকে।

3. নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ:
নিজের স্বার্থের জন্য অন্যায়ভাবে আচরণ করে না।
4. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা:
সব কিছুতে আল্লাহর ইচ্ছার স্বীকৃতি ও নির্ভরতা।
5. সামাজিক দায়বদ্ধতা:
অন্যদের কল্যাণে অবদান রাখা।

ঈমানের ছয়টি মৌলিক শর্তই একটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এগুলি শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক।

আল্লাহর প্রতি ঈমান জীবন পরিচালনার মূল কেন্দ্র।

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক ও আল্লাহভীতিপূর্ণ আচরণ শেখায়।

কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস জীবনের দিশা নির্ধারণ করে।

আখিরাত ও তাকদিরে বিশ্বাস ধৈর্য, আশা ও স্বীকারোক্তি বৃদ্ধি করে।
এই মৌলিক শর্তসমূহের বাস্তবায়ন মানুষকে আত্মিক স্থিতিশীলতা, নৈতিক শক্তি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রদান করে। ফলে ঈমান কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়—এটি জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার উৎস।

> "এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি, ধৈর্য ও কল্যাণের পথ।"
(সূরা আল-আনফাল: ৪৫, সারসংক্ষেপ)
ঈমানের মৌলিক শর্তগুলো ঠিকভাবে বোঝা এবং তা পূর্ণতার সঙ্গে পালন করা একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

## ১১. ঈমান ও কাজের সম্পর্ক

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈমান। কিন্তু শুধু মুখে ঈমানের ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়; বরং সেই ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন মানবজীবনের প্রতিটি কাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কর্মহীন ঈমান যেমন অপূর্ণ—তেমনি ঈমানহীন কর্মও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী আকীদার আলোকে ঈমান ও আমল (কাজ) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত একটি সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

ঈমান কেবলমাত্র মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের নাম নয়; এই বিশ্বাস মানুষের মন, চরিত্র, আচরণ ও কর্মকাণ্ডে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃত ঈমানী ব্যক্তি তার জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে। তার নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক আচরণে ঈমানের দৃশ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়

ইসলামের পরিভাষায় “ঈমান” ও “আমল” মানবজীবনের উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দুটি অগ্রগণ্য উপাদান। ঈমান হলো বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, আর আমল (কাজ) হলো সেই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এই দুটির সম্পর্ক এমন—যা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব। ইসলামী শিক্ষায় ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয়; বরং বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং কাজের প্রকাশ—এ ত্রয়ী মিলেই পূর্ণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন—

> “ঈমান কেবল বিশ্বাসের নাম নয়; বরং কাজ দ্বারা এটি পূর্ণতা পায়। কাজ ব্যতীত ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না।”
(মাজমুআ ফাতাওয়া)

অতএব, ইসলামী আকীদায় ঈমান ও কাজের সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য সত্য।

ঈমানের ধারণা ও এর কার্যগততা

কুরআনের বহু আয়াতে ঈমানের সাথে সৎকর্মকে যুগ্মভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ৬০টিরও বেশি স্থানে "আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত" বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে—

ঈমান মূল,

আমল ফল।

যে গাছের শক্তমূল নেই, সে গাছ টিকে থাকতে পারে না;
যে গাছে ফল নেই, তার উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ।

ঠিক তেমনি—

কাজহীন ঈমান দুর্বল ও জীবনবিমুখ

ঈমানহীন কাজ ব্যর্থ ও পরকালবিমুখ

কুরআনে বলা হয়েছে—
"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—আমি অবশ্যই তাদের প্রতিদান নষ্ট করি না।"
(সূরা আল-কাহফ: ৩০)

ঈমান ও কাজ: সামাজিক মূল্যবোধ

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং তা সমাজিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। একটি ঈমানদার সমাজ—

১ ন্যায়পরায়ণ
২ সত্যবাদী
৩ শান্তিপূর্ণ
৪ একে অপরের হক রক্ষাকারী

যেখানে ঈমান শক্তিশালী, সেখানে ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায়, নৈতিক অবক্ষয় হ্রাস পায়।

কারণ প্রকৃত ঈমান মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> “প্রতিটি কাজের হিসাব রয়েছে, আল্লাহ দেখছেন।”

এই বিশ্বাসই মানবসম্পর্কে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠা করে।

কাজের মাধ্যমে ঈমানের সাক্ষ্য

রাসূল ﷺ বলেন—
“মুসলিম সে-ই, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।”
(সহীহ বুখারি)

এখানে ঈমানের পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে আচরণ দিয়ে—
অর্থাৎ, নৈতিক কাজই ঈমানের পরিমাপক।

হাদীসে আরও এসেছে—
“লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।”
(সহীহ মুসলিম)

এতেও বোঝা যায়—
যে আচরণে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও গোনাহ—সেখানে ঈমানের দুর্বলতা।

ঈমানের বৃদ্ধি-হ্রাস ও কর্মসম্পৃক্ততা

ঈমান একটি স্থির ধারণা নয়; এটি বাড়ে ও কমে।

সৎকর্মে বৃদ্ধি

অসৎকর্মে হ্রাস

কুরআনে বলা হয়েছে—
“যাতে তারা নিজেদের ঈমানে আরও বৃদ্ধি পায়।”
(সূরা আল-ফাতহ: ৪)

একজন ঈমানদার যখন—
নামাজ পড়ে, জাকাত দেয়, রোজা রাখে, মায়ের সেবা করে, অন্যের কল্যাণ করে—
তখন তার ঈমান শক্তিশালী হয়।

কিন্তু—
মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার, হারাম উপার্জন—
এসব ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ঈমান ও কাজের বিচ্ছিন্নতার অপকারিতা

ঈমান শুধু মুখের স্বীকারোক্তি হলে—
➔ ভণ্ডামি, দুর্নীতি এবং আত্মকেন্দ্রিকতা জন্ম নেয়।
কুরআনে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু কাজে তার প্রতিফলন নেই।

আল্লাহ বলেন:
“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দুনিয়ার সবচেয়ে নীচু স্থানে থাকবে।”
(সূরা আন-নিসা: ১৪৫)

এ থেকে প্রতীয়মান—
যে ঈমান কাজে প্রতিফলিত না হয়, তা ধ্বংসের কারণ।

ঈমান ও কাজ: আখিরাতের সফলতার মাপকাঠি

ইসলামের বিচারব্যবস্থায়—
ঈমান হবে সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত,
সৎকর্ম হবে মূল্যায়নের ভিত্তি।

কুরআনে বলা হয়েছে—
“যার দানার ওজন পরিমাণ সৎকর্ম থাকবে, সে তার প্রতিফল পাবে।”
(সূরা যিলযাল: ৭)

এ থেকেই বোঝা যায়—
শেষ বিচারে কাজই হবে ঈমানের মানদণ্ড।

ইতিহাসের উদাহরণ
সাহাবীদের জীবনই ঈমান ও কাজের সফল সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—

বীরত
ন্যায়পরায়ণতা
উদারতা
ত্যাগ ও মানবসেবা
তারা যে ঈমান পোষণ করতেন—
সেটি শুধু অন্তরে ছিল না; জীবনের প্রতিটি ক্ষণে কর্মের দ্বারা প্রকাশ পেত।

আধুনিক সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজ যে—

নৈতিক অবক্ষয়,
দুর্নীতি,
পরিবার ভাঙন,
সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত—

এর প্রধান কারণ—
ঈমান ও কাজের বিচ্ছিন্নতা।
শুধু ঈমানের দাবিতে সমাজের সংস্কার সম্ভব নয়; বরং ঈমানের অনুবাদ প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি কাজে।

ঈমান ও কাজের সম্পর্ক দ্বিমাত্রিক নয় বরং একীভূত সম্পর্ক। ঈমান যেমন আমলের উৎস, আমল তেমনি ঈমানের যাচাই ও বিকাশের প্রধান মাধ্যম। তাই মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে ঈমানকে কেন্দ্রে রেখে সেই ঈমানকে কাজে বাস্তবায়ন করাই ইসলামের লক্ষ্য।

সত্যিকারের ঈমান—

- আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস
- রাসূল ﷺ এর নির্দেশ অনুসরণ
- নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ

এ তিনটি স্তম্ভের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সে কারণেই ইসলাম ঘোষণা করে—
"সফল তারা—যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"
(সূরা আল-মু'মিনুন: ১-২)

অতএব, ঈমানকে শক্তিশালী করতে হলে সৎকর্ম বাড়াতে হবে এবং সৎকর্ম ধারাবাহিক রাখতে হলে ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে। এই সমন্বয়ই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম।

**১২। ইমান ভঙ্গের কারণ:**

ইমান হলো মানুষের আত্মার অমূল্য দ্যুতি, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। এটি শুধুমাত্র বিশ্বাসের নাম নয়; এটি মানুষের চরিত্র, চিন্তা ও কর্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তিও বটে। যখন একজন মানুষের হৃদয়ে ইমানের আলো নিভে যায়, তখন তার জীবন ধ্বংসাত্মক অনিশ্চয়তা, হতাশা এবং নৈতিক দুর্বলতার মধ্যে পড়ে।

কিন্তু কেন কোনো মানুষ ঈমানে দৃঢ় থেকে হঠাৎ দুর্বল হয়ে যায়? কেন তাদের অন্তর এক ধরনের দ্বিধা, সন্দেহ বা অবিশ্বাসের শিকার হয়? ইসলামের শিক্ষায় দেখা যায়, ইমান ভঙ্গের কারণ মূলত তিন প্রকার:

১. বিশ্বাসগত

বিশ্বাসগত কারণে যখন কোনো মানুষ আল্লাহর প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস হারায় বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তখন তার আত্মায় অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসে।
যেমন,
শিরক করা
আল্লাহ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে দ্বিধা বা সন্দেহ
কুরআন বা হাদিসের সত্যতা অস্বীকার করা
নেক-দুর্নীতির সীমা বা নৈতিকতার ভিত্তি অগ্রাহ্য করা

২.কর্মগত

কর্মগত কারণে পাপাচার, অবহেলা বা সৎ কাজের অভাব ইমানকে ক্ষয় করে।
যেমন,

নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ পালন না করা
সৎ কাজের অবহেলা করা
মন্দ কাজ ও পাপাচার বৃদ্ধি
মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করা (যেমন: মিথ্যা বলা, চুরি, হানিকর কাজ)

৩.ব্যক্তিগত আচরণগত।
ব্যক্তিগত কারণে অহংকার, লোভ বা হতাশা মানুষের অন্তরের আলোকে ম্লান করে।
যেমন,
অহংকার ও
লোভ, হিংসা ও ঈর্ষা
সদা হতাশা বা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী মনোভাব

১. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা-

শিরক হলো এমন অপরাধ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। শিরকের মাধ্যমে ব্যক্তি সরাসরি ঈমানচ্যুত হয়ে যায়।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا

( সুরা নিসা আয়াত ৪৮)

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, সে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত হল।

আবু জাকারিয়া,

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক [১] করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন [২]। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।

[১] আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, যে কোনো সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে তেমন কোনো বিশ্বাস পোষণ করাই হল শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্ট বস্তুকে ইবাদাত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শির্ক। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করেছেন
যে, "আল্লাহর শপথ, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।" সূ[রা আশ-শু'আরা ৯৭-৯৮]

শির্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল।

অন্য আয়াতে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা শির্ককারীদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, ... তবে যদি তারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে।" [সূরা আল-ফুরকান ৭০] সুতরাং তাওবাহ্ করলে শির্কও মাফ হয়ে যায়।
[২] আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা কবীরা গোনাহকারীর জন্য ইস্তেগফার করা থেকে বিরত থাকতাম। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আয়াত শুনলাম এবং আরো শুনলাম যে, তিনি বলছেন: 'আমি আমার দো'আকে গচ্ছিত রেখেছি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্গারদের সুপারিশ করার জন্য। ইবন উমর বলেন, এরপর আমাদের অন্তরে যা ছিল তা অনেকটা কেটে গেল ফলে আমরা ইস্তেগফার করতে থাকলাম ও আশা করতে থাকলাম। [মুসনাদে আবি ইয়া'লা ৫৮১৩]

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শিরক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। [১] আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক) করে, সে এক মহাপাপ করে। [২]

[১] অর্থাৎ, এমন অপরাধ ও গুনাহ, যা থেকে তওবা না করেই মু'মিন মারা গেছে। আল্লাহ তাআলা কারো জন্য চাইলে কোন প্রকারের শাস্তি না দিয়েই তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে শাস্তি দেওয়ার পর ক্ষমা করবেন। আবার অনেককে নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কোন অবস্থাতেই মাফ হবে না। কেননা, মুশরিকের উপর তিনি জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

[২] অন্যত্র বলেছেন, [إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم] "শিরক হল সব চেয়ে বড় অন্যায়।" (লুকমানঃ ১৩) হাদীসেও শিরককে সব থেকে বড় পাপ গণ্য করা হয়েছে। أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِالله ...।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَ যে, "আল্লাহর শপথ, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।" সূ[রা আশ-শু'আরা ৯৭-৯৮]

শির্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার

যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল। অন্য আয়াতে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা শির্ককারীদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, ... তবে যদি তারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে।" [সূরা আল-ফুরকান ৭০] সুতরাং তাওবাহ্ করলে শির্কও মাফ হয়ে যায়।

[২] আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা কবীরা গোনাহকারীর জন্য ইস্তেগফার করা থেকে বিরত থাকতাম। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আয়াত শুনলাম এবং আরো শুনলাম যে, তিনি বলছেন: 'আমি আমার দো'আকে গচ্ছিত রেখেছি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্গারদের সুপারিশ করার জন্য। ইবন উমর বলেন, এরপর আমাদের অন্তরে যা ছিল তা অনেকটা কেটে গেল ফলে আমরা ইস্তেগফার করতে থাকলাম ও আশা করতে থাকলাম। [মুসনাদে আবি ইয়া'লা ৫৮১৩]

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে,

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শিরক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। [১] আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক) করে, সে এক মহাপাপ করে। [২]

[১] অর্থাৎ, এমন অপরাধ ও গুনাহ, যা থেকে তওবা না করেই মু'মিন মারা গেছে। আল্লাহ তাআলা কারো জন্য চাইলে কোন প্রকারের শাস্তি না দিয়েই তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে শাস্তি দেওয়ার পর ক্ষমা করবেন। আবার অনেককে নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কোন অবস্থাতেই মাফ হবে না। কেননা, মুশরিকের উপর তিনি জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

[২] অন্যত্র বলেছেন, [إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم] "শিরক হল সব চেয়ে বড় অন্যায়।" (লুকমানঃ ১৩) হাদীসেও শিরককে সব থেকে বড় পাপ গণ্য করা হয়েছে। أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِالله ...।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَا

‘কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।’ [সুরা মায়িদা, ৫ : ৭২]

এতে অন্তর্ভুক্ত—

কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ে ধরা
তার কাছ থেকে অদ্বিতীয় ক্ষমতা আশা করা
মূর্তি, কবরে ইবাদত করা
এর নৈতিক বিপর্যয়:

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতি
পাপাচার ও অন্ধবিশ্বাসের চর্চা বৃদ্ধি
২. আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো-

যেমন মৃত ব্যক্তি বা অলিদের কাছে দো‘য়া করা যে—তারা আমাদের পক্ষে ক্ষমা করাবে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘তারা আল্লাহকে ব্যতীত যার ইবাদাত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।’ [সুরা ইউনুস, ১০ : ১৮]

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

‘জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরুপে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, ইহারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।’ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।’ [সুরা যুমার, ৩৯ : ৩]

৩.মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করা।

যে ব্যক্তিকে কুরআন-হাদিস অকাট্যভাবে কাফির আখ্যা দিয়েছে তাকে মুসলিম ভাবা কুফরি। যেমন—

এমন কাফির, যার কুফরির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ একমত। সেটা আসলি কাফির হতে পারে—যেমন ইহুদি, খৃস্টান ও হিন্দু সম্প্রদায়, আবার মুরতাদ, যিনদিকও হতে পারে, যেমন প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসুল বা দীনের কোনো অকাট্য ব্যাপার নিয়ে কটূক্তিকারী, যাদের কুফরির ব্যাপারে হকপন্থি আলিমগণ একমত।
যেমন,
যীশুকে আল্লাহর পুত্র বলা
আল্লাহ বা রসূলকে গালি দেওয়া
কুরআন অস্বীকারকারী

এতে সত্য-মিথ্যার সীমারেখা ভেঙে যায়।

৪. নবি (সা.)’র ফয়সালার তুলনায় অন্য কারও ফয়সালাকে উত্তম মনে করা।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। তারা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতে চায় তাগুতের কাছে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। [সুরা নিসা, ৪ : ৬০

৫. মুহাম্মাদ (সা.) আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে। এরপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' [সুরা নিসা, ৪ : ৬৫]

৬. দীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

ধর্ম, কুরআন, হাদীস বা আলেমদের নিয়ে উপহাস ঈমান ধ্বংসকারী।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعِ

"তুমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?' তোমরা অযুহাত দেয়ার চেষ্টা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।" [সুরা তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬]

বর্তমান সমাজে রসিকতা ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটি খুবই সাধারণ হয়ে গেছে।

৭. জাদু করা

জাদু শয়তানের কাজ; এর সাথে সংশ্লিষ্টতা কুফরি-বিশ্বাসের পথ।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

'সুলাইমান কুফরি করেনি, কুফরি তো করেছিল শয়তানরাই। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত...।' [সুরা বাকারা, ২ : ১০২]

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা।

ধর্মবিরোধী শক্তিকে সঙ্গ দেওয়া ঈমান ধ্বংস করে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون َ

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইও যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরিকে বেছে নেয়, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।’ [সুরা তাওবা, ৯ : ২৩]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ َ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।’ [সুরা মায়িদা, ৫ : ৫১]

৯. কাউকে দীন-শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ِ

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।’ [সুরা মায়িদা, ৫ : ৩]

১০. দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ َ

‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হয়েও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক অপরাধী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।’ [সুরা সাজদা, ৩২ : ২২]

**১৩. সমাজে ঈমান ভঙ্গের প্রভাব:**

ঈমান হলো ব্যক্তির নৈতিকতা ও জীবনের দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস। একজন ঈমানদার মুসলিম যখন আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে জীবন পরিচালনা করে, তখন সে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে—সত্য, ন্যায়, সততা, বিশ্বস্ততা ও মানবিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন ঈমান ভঙ্গ হয়—বিশ্বাস, কথা বা আচরণের মাধ্যমে—তখন তা সমাজের নৈতিক গঠনতন্ত্রকে নষ্ট করে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান ভঙ্গ সমাজের শান্তি, ঐক্য ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি মহাবিপদ।
**১৩.১** নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধ বিস্তার
কুরআনে বলা হয়েছে:

> “যে আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্য সংকীর্ণ জীবন নির্ধারণ করি।”
— সূরা ত্বাহা: ১২৪

ঈমান ভঙ্গকারী ব্যক্তি আল্লাহভীতি হারায়; ফলে তার কাছে পাপকর্ম স্বাভাবিক মনে হতে থাকে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জায়গায় দখল করে নেয়—
দুর্নীতি
স্বার্থপরতা
প্রতারণা
অশ্লীলতা

চুরি ও অন্যায়
সমাজে অপরাধের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিচার ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে।
**১৩.২** সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের অবক্ষয়
মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো ঈমান:
> “নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।”

— সূরা হুজুরাত: ১০

কিন্তু ঈমানভঙ্গ হলে—
সামাজিক বিভেদ বৃদ্ধি পায়
হিংসা-বিদ্বেষ বাড়ে
দলাদলি ও সংঘাত তৈরি হয়
যখন সমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা হারিয়ে যায়, তখন সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

১৩.৩ ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলার ধ্বংস
যেখানে ঈমান নেই, সেখানে ন্যায়বিচারের শক্ত ভিতও নেই।
নবী ﷺ বলেছেন:
> “যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”
— সহিহ মুসলিম

ঈমান ভঙ্গের ফলে—
বিচারহীনতা সমাজে অন্যায়কে উৎসাহ দেয়
ক্ষমতাধররা দুর্বলদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়
সত্য ও অসত্যের সীমারেখা মিলিয়ে যায়
এতে জনমনে ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়।

১৩.৪ পরিবার ব্যবস্থার বিপর্যয়

পরিবারই একটি সমাজের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঈমানহীন পরিবারে—
বিশ্বস্ততা ও আস্থার অভাব

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কলহ
সন্তানের নৈতিক চরিত্রহীনতা
বিবাহবিচ্ছেদের বিস্তার
ফলে সমাজে সুস্থ প্রজন্ম গড়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে।

## ১৩.৫ দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক সংকট

ঈমান ভঙ্গ শুধু সামাজিক না—
এটি মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ডেকে আনে।

নবী ﷺ বলেছেন:

> "দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে, সেটি ঠিক হলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকে; আর সেটি নষ্ট হলে সবকিছু নষ্ট হয়। সেটি হলো অন্তর (ঈমান)।"
— সহিহ বুখারি
ঈমান হারালে—
হৃদয় কঠিন হয়ে যায়

জীবন থেকে বরকত উঠে যায়
উদ্বেগ, ভয় ও হতাশা বৃদ্ধি পায়
সমাজ হয় হতাশাবাদী, উদ্দেশ্যহীন।

## ১৩.৬ রাষ্ট্র ও সভ্যতার পতন

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় —
যখন একটি জাতির ঈমান দুর্বল হয়, তারা শক্তি হারায়।
মুসলিম বিশ্বে পতনের মূল কারণ ছিল—

ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্নতা
ক্ষমতার লালসা
নৈতিক দুর্নীতি
ফলে তারা শক্তিশালী শত্রুর কাছে পরাজিত হয়।
সংক্ষেপে
ঈমান ভঙ্গের কারণ  সমাজের ক্ষতি

**১৪.নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইমান**

নৈতিক দুর্বলতা অপরাধ বৃদ্ধি, অবক্ষয়
বিশ্বাসহীনতা সামাজিক বিভেদ
অন্যায়কারীদের অনুসরণ বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়া
পরিবারে ঈমানের অভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট
আল্লাহর দিকনির্দেশনা অমান্য সামাজিক অস্থিরতা ও পতন

সমাপনী উপলব্ধি

ঈমান সমাজের ভিত্তি
আর সেই ভিত্তি ভেঙে গেলে সমাজ ভেঙে পড়ে।
তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব—
নিজেদের ঈমান রক্ষা করা
সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ শক্তিশালী করা
ঈমানভঙ্গের কারণসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকা
১৪. নৈতিক ও সামাজিক
বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় মুসলিম সমাজ নানা নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রযুক্তির অগ্রগতি, বিশ্বায়ন, ধর্মীয় উদাসীনতা, বস্তুবাদী চিন্তা, ধর্মবিদ্বেষ, অনৈতিক বিনোদন, পরিবারব্যবস্থার ভাঙন এবং যুবসমাজের চরিত্র সংকট—এসব চ্যালেঞ্জ ঈমানকে নানাভাবে আঘাত করছে। এই পরিস্থিতিতে ঈমান শুধু একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নয়; বরং তা মুসলিমের নৈতিক দৃঢ়তা, আত্মিক শক্তি এবং জীবনচর্চার পথনির্দেশক।

১. বস্তুবাদী জীবনধারার চ্যালেঞ্জ

আজকের পৃথিবীতে সফলতার মানদণ্ড হিসেবে সম্পদ, খ্যাতি, ভোগবিলাস ইত্যাদিকে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে ঈমানভিত্তিক চাহিদা ও পরকালের সফলতার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বস্তুবাদ মানুষকে আল্লাহর স্মরণহীনতা ও গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়।

২. নৈতিক স্খলন এবং অশ্লীলতার বিস্তার

ইন্টারনেট, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশ্লীলতা ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ ছড়াচ্ছে। পর্নোগ্রাফি, জেন্ডার বিভ্রান্তি, অবাধ সম্পর্ক, বিয়ে বিলম্বিত হওয়া, বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি—এসবই ঈমান নষ্টের শক্তিশালী কারণ।
৩ ধর্মীয় উদাসীনতা ও সংশয়বাদ

আধুনিক সেকুলার শিক্ষা ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার ব্যাপক প্রসার তরুণ প্রজন্মের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। একশ্রেণির মানুষ ধর্মকে কুসংস্কার মনে করে; আরেকদল ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন থেকে জীবন কাটায়।

৪. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সংকট

দলাদলি, মতপার্থক্য, রাজনৈতিক বিভাজন এবং ক্ষমতার লড়াই উম্মাহর শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ দিনদিন কমে যাচ্ছে।

৫. ইসলামবিদ্বেষ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বহু দেশে মুসলিম পরিচয় শত্রুতা ও নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণে মুসলিম যুবসমাজ নিজস্ব পরিচয় ভুলতে বসেছে।

৬. ঈমানই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মূল শক্তি

ইসলাম ঈমানদারকে শেখায়—
ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা
নৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মশুদ্ধি
সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার বিরোধিতা
সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা

কুরআন মানবতার সামনে নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।
রাসূল ﷺ দেখিয়েছেন কীভাবে কঠিনতম সামাজিক চাপের মাঝেও ঈমান দৃঢ় রাখা যায়।

৭.বাস্তবিক করণীয়

ক্ষেত্র করণীয়
ব্যক্তি নামাজ, কুরআন, জ্ঞান অর্জন, আত্মশুদ্ধি
পরিবার ইসলামী পরিবেশ, সন্তানদের আকীদা শিক্ষা
সমাজ দাওয়াত, নৈতিকতার প্রচার, মসজিদকেন্দ্রিক কার্যক্রম
শিক্ষা ঈমানভিত্তিক জ্ঞানবিপ্লব, ইসলামিক কারিকুলাম
রাষ্ট্র ন্যায়নীতি ও ইসলামি মূল্যবোধসম্মত আইন
কারণ — ঈমান কেবল হৃদয়ের অনুভূতি নয়; বরং তা বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণাঙ্গ সংগ্রাম

## ১৫. ঈমানের দৃঢ়তার জন্য নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব

ঈমান ইসলামের মৌলিক ভিত্তি; তবে এটি শুধু একটি বিশ্বাসগত স্বীকারোক্তি নয়—বরং একটি জীবন্ত নৈতিক শক্তি, যা আচরণ, চরিত্র, সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক ও সমাজ গঠনের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে। ঈমান স্থির নয়; বরং মানুষের কর্মকাণ্ড, পরিবেশ, অভ্যাস ও নৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে এটি বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। তাই ঈমানকে দৃঢ় রাখার জন্য নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব অপরিহার্য।

এই অধ্যায়ে ঈমান দৃঢ় রাখার জন্য ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব, সমাজের ভূমিকা, সাংস্কৃতিক প্রভাব, পরিবেশগত ফ্যাক্টর, শিক্ষামূলক প্রভাব, নেতৃত্বের ভূমিকা, পরিবার-পরিমণ্ডল, প্রযুক্তির যুগে নৈতিক চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১৫.২ ঈমান দৃঢ়তার মৌল ভিত্তি: নৈতিক দায়িত্বের গুরুত্ব
১৫.২.১ ঈমান ও নৈতিকতার অভিন্ন সম্পর্ক
ইসলামে ঈমান ও নৈতিকতা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।
ঈমান মজবুত হলে নৈতিকতা দৃঢ় হয়, আর নৈতিকতা দুর্বল হলে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নৈতিক চরিত্র (akhlaq) হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। তাই নৈতিক দায়িত্ব পালন করা মানেই ঈমানকে শক্তিশালী করা।

মূল নৈতিক দায়িত্বগুলো হলো—

1. সত্যবাদিতা
2. আমানতদারিতা
3. পবিত্রতা ও পরহেযগারি
4. ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা
5. ন্যায়পরায়ণতা
6. আত্মসংযম
7. আল্লাহভীতি (তাকওয়া)
8. করুণা, দয়া, ক্ষমাশীলতা

এই নৈতিক গুণগুলো ব্যক্তির আচরণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তার ঈমানও শক্ত থাকে

**১৫.২.২ তাকওয়া: ঈমান দৃঢ়তার কেন্দ্রবিন্দু**

তাকওয়া হলো এমন সচেতনতা, যা মানুষকে আল্লাহর বিধান মানতে এবং পাপ থেকে বাঁচতে বাধ্য করে।

তাকওয়া ছাড়া ঈমান স্থায়ী হয় না।

তাকওয়ার দায়িত্ব—

পাপ থেকে দূরে থাকা

আল্লাহর নির্দেশ পালনে সক্রিয় হওয়া

অন্তরে আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা

গোপন ও প্রকাশ্যে একই চরিত্র ধারন

**১৫.২.৩ আত্মশুদ্ধির নৈতিক দায়িত্ব (তাযকিয়াতুন নফস)**

আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য ব্যক্তির দায়িত্ব—

নফসের কুমন্ত্রণা প্রতিরোধ

অহংকার দমন

ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ থেকে দূরে থাকা

নিয়মিত আত্মসমালোচনা

ভালো সঙ্গ ও পরিবেশ গ্রহণ

আত্মশুদ্ধি ছাড়া ঈমান স্থায়ী শক্তি পায় না।

**১৫.৩ সামাজিক দায়িত্ব: ঈমান রক্ষার সমষ্টিগত কাঠামো**

১৫.৩.১ সমাজের ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব; তার নৈতিকতা ও ঈমান পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল।

একটি সমাজে যদি—

দুর্নীতি

অসচ্চরিত্র

অন্যায়

অশ্লীলতা

মিথ্যাচার

প্রতারণা

নৈতিক শিথিলতা

বেশি থাকে, তবে মানুষের ঈমানও দুর্বল হতে থাকে। তাই সমাজে কল্যাণমূলক পরিবেশ তৈরি করা ঈমান রক্ষার সামাজিক দায়িত্ব।

১৫.৩.২ সৎ সমাজ (সালিহ সমাজ) প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

সৎ সমাজ গঠনের সামাজিক দায়িত্বগুলো—

1. ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো
2. দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া
3. সামাজিক সহায়তা (যাকাত, সদকা, ওয়াকফ)
4. মসজিদ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা
5. সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা

একটি সৎ সমাজ ঈমানকে সমষ্টিগতভাবে সুরক্ষিত রাখে।

---১৫.৩.৩ পরিবার: ঈমান রক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান

পরিবার ঈমানের শিক্ষা ও নৈতিকতা গঠনের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র।

পরিবারের দায়িত্ব—

ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি

নামাজ শেখানো

কুরআন শিক্ষা

নৈতিক গল্প, ইতিহাস, সীরাত শেখানো

পিতা-মাতার ঈমানি আচরণ দিয়ে সন্তানকে উদাহরণ দেওয়া
পরিবারে ঈমান দৃঢ় না হলে সমাজেও তা দুর্বল হয়ে যায়।
১৫.৪ শিক্ষার দায়িত্ব: জ্ঞান ও ঈমানের সমন্বয়
১৫.৪.১ ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা
ঈমানকে গভীর ও স্থায়ী করতে ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য।
ধর্মীয় শিক্ষা—
ঈমানের ভিত্তি দেয়
নৈতিকতা শেখায়
আল্লাহর প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে
পাপ থেকে দূরে রাখে
১৫.৪.২ আধুনিক শিক্ষায় ঈমানের সুরক্ষা

আধুনিক শিক্ষা কখনোই ঈমানবিরোধী নয়, তবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নৈতিকতাহীন শিক্ষা তরুণদের ঈমান দুর্বল করে।
সেজন্য দায়িত্ব—
বিজ্ঞানের সাথে নৈতিকতা মিলিয়ে পাঠদান
ইতিহাস ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা
শিক্ষকদের চরিত্রবান হওয়া
পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধ সংযোজন
১৫.৪.৩ জ্ঞানচর্চার নৈতিক প্রকৃতি
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব—

জ্ঞানকে আল্লাহর পথ দেখার উপায় হিসেবে ব্যবহার
অহংকার না তৈরি করা
জ্ঞানের অপব্যবহার না করা
মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ
জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ঈমান শক্তিশালী হয়।

১৫.৫ অর্থনৈতিক দায়িত্ব: হালাল-হারামের সচেতনতা

১৫.৫.১ হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

হারাম উপার্জন ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
একজন মুমিনের দায়িত্ব—
হালাল উপার্জন
সুদ থেকে বাঁচা
প্রতারণা ও ঘুষ এড়িয়ে থাকা
কর্মচারীর অধিকার দেওয়া
১৫.৫.২ অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও জবাবদিহি
অর্থনৈতিক অন্যায়, জুলুম, কর ফাঁকি, বেআইনি মুনাফা ঈমানকে দুর্বল করে।
সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বও—
স্বচ্ছ অর্থনীতি

জবাবদিহি

ন্যায় বিচার
১৫.৬ প্রযুক্তি ও মিডিয়ার যুগে ঈমান রক্ষার দায়িত্ব

১৫.৬.১ ডিজিটাল নৈতিকতা

আজকের যুগে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, কনটেন্ট—এসব ঈমান দুর্বল করার বড় মাধ্যম।
দায়িত্ব—

অশ্লীলতা থেকে বাঁচা

সময় অপচয় নিয়ন্ত্রণ

ভুয়া তথ্য শেয়ার না করা

অনলাইন আচরণে নৈতিকতা অনুসরণ
১৫.৬.২ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মসংযম

নতুন প্রযুক্তি—
প্রলোভন সৃষ্টি করে
আসক্তি বাড়ায়
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে
একজন মুমিনের দায়িত্ব এটি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা।
১৫.৭ ঈমান রক্ষায় আত্মিক ও ইবাদতমূলক দায়িত্ব

১৫.৭.১ নামাজ: ঈমানের ঢাল

নামাজ গুনাহ থেকে বাঁচায় ও ঈমান শক্তিশালী করে।
নামাজ না পড়লে ঈমান দুর্বল হয়

১৫.৭.২ কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন

কুরআনের আলো হৃদয়কে শক্তিশালী করে, সন্দেহ দূর করে
১৫.৭.৩ দোয়া ও যিকির

এগুলো ঈমানকে জীবন্ত রাখে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার করে

১৫.৭.৪ রোজা, যাকাত, হজ
ইসলামের স্তম্ভগুলো ঈমানকে—

শুদ্ধ করে
পরিশুদ্ধ করে
আল্লাহর প্রতি আস্থা দৃঢ় করে
**১৬: ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঈমান রক্ষা**
ঈমান মুসলিম জীবনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। পৃথিবীতে অবস্থানের সময় এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি হলো ঈমান। ইসলামী শরীয়ত ঈমানকে রক্ষার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা

দিয়েছে। যেমন দেহ রক্ষার জন্য খাদ্য জরুরি, তেমনি ঈমান রক্ষার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আমল, সতর্কতা ও বিধান মানা অপরিহার্য। এই অধ্যায়ে ঈমান রক্ষার জন্য শরিয়তের আলোকে কুরআন-হাদিসভিত্তিক কার্যকর পন্থা আলোচনা করা হবে।

১৬.২ ঈমান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য
২. ধর্মীয় পরিচয় অটুট রাখার জন্য
৩. শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য
৪. সমাজে নীতি-নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য
৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য

কুরআন বলে:
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করার অধিকার রয়েছে এবং অবশ্যই মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো।”
— সূরা আলে ইমরান: ১০২

১৬.৩ ঈমান রক্ষার মৌলিক ইসলামি বিধান

ইসলাম ঈমান রক্ষার জন্য বহুমাত্রিক নির্দেশনা দিয়েছে—

ক) তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

— আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা।
— রিয়াজত ও আচার-আচরণে কেবল আল্লাহর ইবাদত করা।

খ) শিরক ও কুফরের সকল মাধ্যম থেকে বেঁচে থাকা

— কবরে সেজদা, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে উপাস্যের স্থানে বসানো, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

গ) সুন্নাহর অনুসরণ

— নবীর (সাঃ) আদর্শ জীবনযাপন ঈমানকে শক্তিশালী করে।

ঘ) হারাম থেকে বিরত থাকা

— হারাম কাজ ঈমানকে দুর্বল করে, কখনও ধ্বংসও করতে পারে।

ঙ) ইমানদারদের সান্নিধ্যে থাকা

— সৎ সঙ্গ ঈমান বাড়ায়, বদ সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে।

১৬.৪ আল্লাহভীতি (তাকওয়া) ঈমান রক্ষার ঢাল

আল্লাহ দেখছেন—এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত থাকলে ঈমান সুরক্ষিত থাকে।
তাকওয়া ছাড়া ঈমান খুব সহজেই হারিয়ে যেতে পারে।

১৬.৫ জ্ঞান অর্জন: ঈমান রক্ষার প্রধান উপায়

- কুরআন-হাদিসের জ্ঞান
- আকীদাহ শুদ্ধ করা
- দ্বীন শেখা ও শেখানো
  - অজ্ঞতা ঈমান ধ্বংসের প্রধান কারণ

হাদিসে আছে:
“যার প্রতি আল্লাহ কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।”
— সহিহ বুখারি

১৬.৬ ইবাদতের মাধ্যমে ঈমানকে শক্তিশালী করার বিধান

১. নামাজ – ঈমানের প্রমাণ
২. যাকাত – হৃদয়ের লোভ দূর করে
৩. সিয়াম – বদ অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ
৪. হজ – তাকওয়ার পূর্ণতা
৫. কুরআন তিলাওয়াত – ঈমান জাগ্রত রাখে

১৬.৭ ঈমান রক্ষায় নৈতিকতা

- সত্যবাদিতা
- বিশ্বস্ততা
- আমানতদারিত্ব
- লজ্জাশীলতা
- সদাচরণ

হাদিস:
“লজ্জা ঈমানের অংশ।”
— সহিহ মুসলিম

১৬.৮ হারাম বিষয় হতে দূরে থাকা
হারাম বিষয় ঈমানের উপর ক্ষতি

সুদ হৃদয় কঠোর করে
জিনা লজ্জাশীলতা নষ্ট করে
মদ/নেশা বিবেক নষ্ট করে
মিথ্যা ঈমানকে কমায়

১৬.৯ ঈমান রক্ষায় সৎ সঙ্গ

কুরআন বলে:

“সত্যবাদীদের সঙ্গ গ্রহণ করো।”
—সূরা আত-তাওবা: ১১৯

খারাপ সঙ্গ মানুষকে শিরক-বিদআতে, এমনকি নাস্তিকতায় নিয়ে যায়।
১৬.১০ বিদআত থেকে বিরত থাকা

বিদআত ঈমানের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে।
নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন:
“প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা।”
— সহিহ মুসলিম

১৬.১১ ঈমান রক্ষায় তাওবা ও ইস্তিগফার

প্রতিনিয়ত রুহানী পবিত্রতা বজায় রাখে।
তাওবা = ঈমানের নবায়ন

১৬.১২ পরীক্ষার সময়ে ধৈর্য

- বিপদে স্থির থাকা
- আল্লাহর উপর ভরসা রাখা
- হতাশা এড়িয়ে চলা

ধৈর্য + তাওয়াক্কুল = ঈমান রক্ষার শক্ত ঘাঁটি

১৬.১৩ আধুনিক সময়ে ঈমান রক্ষার চ্যালেঞ্জ ও বিধান

| চ্যালেঞ্জ | ইসলামী সমাধান |
|---|---|
| নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ | আকীদাহ শিক্ষা |
| অনৈতিক বিনোদন | তাকওয়া ও নৈতিক শিক্ষা |
| সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার | নিয়ন্ত্রণ ও আল্লাহভীতি |

ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণাসঠিক জ্ঞান প্রচার

১৬.১৪ ইসলামবিরোধী মতবাদ প্রতিরোধ

১. ধর্মনিরপেক্ষতা
২. খ্রিস্টান-মিশনারি কার্যক্রম
৩. নাস্তিক ও র‍্যাশনালিস্ট চিন্তা
৪. মুক্তচিন্তার নামে ধর্মবিদ্বেষ
→ শক্ত যুক্তি ও শরিয়ত জ্ঞান দিয়ে প্রতিহত করা জরুরি।

১৬.১৫ পরিবারে ঈমান রক্ষার বিধান

- সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ঈমানের শিক্ষায় গড়ে তোলা
- ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখা
- পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ইবাদত ও নৈতিকতায় উৎসাহ দেওয়া

১৬.১৬ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঈমান রক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব—
১. ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধ করা
২. শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম অন্তর্ভুক্ত করা
৩. শরিয়াহ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা চালু করা

১৬.১৭ কুরআনী ও সুন্নাহভিত্তিক দোয়া

ঈমান রক্ষার জন্য দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—
“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করো না।”
— সূরা আলে ইমরান: ৮

১৬.১৮ ঈমান রক্ষার জন্য আত্মসমালোচনা

- প্রতিদিন নিজের আমল মূল্যায়ন
- নিয়ত ও কাজ শুদ্ধ করা
- ভুল বুঝলে দ্রুত সংশোধন

১৬.১৯ ঈমান রক্ষার ফলাফল

দুনিয়া-আখিরাতে সম্মান
জাহান্নাম থেকে মুক্তি
নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা

ইসলামের সকল বিধানই মূলত ঈমান রক্ষা ও তার পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত। যে ব্যক্তি তাওহীদে দৃঢ়, সুন্নাহর অনুসারী, তাকওয়াবান, জ্ঞান অর্জনকারী এবং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে চলবে—তার ঈমান নিরাপদ থাকবে। একইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র যদি ইসলামের বিধান মানে, তাহলে সমষ্টিগত ঈমানও রক্ষা পাবে।
এটাই ইসলামের উদ্দেশ্য—
মানুষকে ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করানো।

## ১৭. ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঈমান রক্ষা

ঈমান মুসলিম জীবনের মূর্ত প্রতীক, যা ছাড়া কোনো ইবাদত, নৈতিকতা কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণ হয় না। ঈমান হলো অন্তরের স্বীকৃতি, মুখের উচ্চারণ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ। একজন মুমিনের জীবনে ঈমানকে জীবিত ও পরিপূর্ণ রাখতে হলে ইসলামী বিধানের অনুসরণ অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহ ঈমান কীভাবে রক্ষা করতে হবে তার স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এই অধ্যায়ে ঈমান রক্ষার নীতিমালা, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

১. ঈমান রক্ষার গুরুত্ব
ঈমান গ্রহণের পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব তা সংরক্ষণ করা
ঈমান গ্রহণের অর্থ নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের সোপর্দ করা

ঈমান নষ্ট হলে সকল আমল ও ইবাদত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়
পরকালের সাফল্যের প্রধান শর্ত ঈমান অটুট রাখা

আল্লাহ বলেন:

> “হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি..."
(সূরা নিসা: ১৩৬)

২. ইসলামে ঈমান রক্ষার মৌলিক নীতিমালা

১. কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মান্য করা
২. আল্লাহর বিধানের প্রতি নিখুঁত আনুগত্য
৩. শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার সকল উপাদান থেকে দূরে থাকা
৪. হক ও বাতিলের ভেদরেখা স্পষ্ট রাখা
৫. ঈমান বৃদ্ধির জন্য আমল ও নৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা

৩. ঈমান নষ্টকারী কারণ থেকে বাঁচার বিধান
ক. বিশ্বাসগত ভুল
আল্লাহর গুণাবলীতে সন্দেহ
কাদার (তাকদির) প্রতি অবিশ্বাস
কুফরি বাক্য বলা
খ. কথামালায় ঈমানের ক্ষতি
ধর্ম নিয়ে উপহাস

কুরআন ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা
গ. কর্মের মাধ্যমে ঈমান ধ্বংস
জাদু করা ও জাদুর উপর আস্থা
মূর্তি পূজা, কবরে সুপারিশ চাওয়া
ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা
৪. ঈমান সংরক্ষণের আমলী দিক
কাজ ফলাফল

৫ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা ঈমান সুদৃঢ় হয়
নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়
যিকির ও দুআ আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ
সুন্নাহর অনুসরণ সঠিক ঈমানের প্রতিফলন
হারাম থেকে বেঁচে থাকা ঈমান কলুষমুক্ত
৫. তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে ঈমান রক্ষা
তাকওয়া ঈমানের ঢাল

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ঈমানকে অটল রাখে
ঈমান ও তাকওয়া যত শক্তিশালী হয়, গুনাহ ও সন্দেহের স্থান তত সংকীর্ণ হয়
৬. আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মান্য করা
আল্লাহর প্রতিটি বিধান মানাই ঈমানের শর্ত
রাসূল ﷺ এর নির্দেশ অমান্য = ঈমানের দুর্বলতা
শরীয়তের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ ঈমান সংরক্ষণের সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি
৭. দ্বীনি জ্ঞান অর্জন: ঈমান রক্ষার প্রধান উপাদান
অজ্ঞতা ঈমান ধ্বংসকারী প্রধান শত্রু
ইলম অর্জন হৃদয়কে আলোকিত করে
শরীয়ত সম্পর্কে যত ধারণা বাড়বে, ঈমান তত শক্ত হবে
হাদীস:
> “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”
(ইবনু মাজাহ)

৮. সদাচরণ ও ঈমানের সম্পর্ক
শিষ্টাচার ঈমানের সৌন্দর্য
অসততা, প্রতারণা, গীবত—ঈমান কমিয়ে দেয়
চরিত্রের উন্নয়ন = ঈমানের উন্নয়ন
৯. গুনাহ থেকে বিরত থাকার বিধান
ছোট গুনাহ থেকেই বড় বিপর্যয় শুরু হয়
নাফস ও শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচা জরুরি
তাওবা ও ইস্তেগফার ঈমানকে নবায়ন করে
১০. সৎ সঙ্গ ও পরিবেশ

খারাপ লোকদের সাথে মেলামেশা = ঈমান দুর্বল
আল্লাহর জিকির হয় এমন পরিবেশ ঈমানকে উজ্জ্বল রাখে
কুরআন:

> নেককারদের সাথে বসো (সূরা কাহফ: ২৮)
১১. ফিতনা ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা
নাস্তিকতার প্রসার, সাইবার ফিতনা, অশ্লীলতা
ইসলামবিদ্বেষীদের বিভ্রান্তি
মুসলিম তরুণদের বিশ্বাসে আঘাত
মিডিয়ার অসত্য প্রচারণা ঈমান ক্ষয় করে

সমাধানঃ
অনলাইন ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধি
ডিজিটাল হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতনতা
১২. পরিবারভিত্তিক ঈমান রক্ষা
সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ঈমানী শিক্ষা
পরিবারে সালাত, কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
ধর্মীয় পরিবেশ গঠন

১৩. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে ঈমান সংরক্ষণ
ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা
ইসলামী শিক্ষা কাঠামো শক্তিশালী করা
ঈমান রক্ষা নিয়ে সমাজ সচেতনতা কার্যক্রম
১৪. রিযালাতুল ঈমান: ঈমানের পাহারাদারি
নিয়মিত আত্মসমালোচনা
ঈমানের হিসাব রাখা
আল্লাহর ভয় ও আশা জীবন্ত রাখা

হাদীস:
> "আমি যে অবস্থায় তোমাদের পাই, সে অবস্থাতেই তোমাদের বিচার করবো।"
(বুখারি)

১৫. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঈমান রক্ষার আদেশ
ঈমান ধরে রাখা আজীবন সাধনা
যে যেমন মৃত্যু বরণ করবে, তেমনই পুনরুত্থান হবে
হাদীস:

> "যার শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
(আবু দাউদ)

ঈমান রক্ষা কোনো মুহূর্তের বিষয় নয়; এটি একটি অব্যাহত সংগ্রাম। ইসলামী বিধান অনুসরণকারী মুসলমানই সঠিক ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান যুগের পরিবেশে ঈমান রক্ষার চ্যালেঞ্জ অনেক, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা আঁকড়ে ধরলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে প্রতিটি মুসলমান শক্ত ঈমান নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকতে পারে।

## ১৮।নবীজীর (সাঃ) দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের চর্চা

ঈমান হলো ইসলামের প্রাণ, ঈমানই সকল নেক আমলের গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র শর্ত। একজন মানুষ ঈমানের ওপর যত বেশি দৃঢ় থাকে, তার দুনিয়া–আখিরাত তত বেশি সফল হয়। এ ঈমানকে টিকিয়ে রাখা ও উন্নত করার জন্য আল্লাহ মানবজাতির সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল হিসেবে প্রেরণ করেছেন শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো মানবজাতির জন্য ঈমানের জীবন্ত শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব রূপ এবং ঈমানের সকল দিক তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁকে অনুসরণ করাই ঈমানকে সঠিকভাবে ধারণ ও চর্চার মূল উপায়।

আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَا نَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَا نَ يَرْجُوا اللهَ وَا لْيَوْمَ الْاٰ خِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا
"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

( সুরা আহযাব আয়াত-২১

রাসুলুল্লাহ সাঃ  ছিলেন—
ঈমানের শিক্ষক
ঈমানের আমানত রক্ষাকারী
ঈমানের রোগের চিকিৎসক
ঈমানের সৌন্দর্যের চিত্রকর
সুতরাং ঈমানকে শক্তিশালী, সংরক্ষিত ও সুন্দর রাখতে হলে তাঁর জীবনই প্রকৃত অনুসরণীয় মানদণ্ড।
১: নবীজীর (সা.) ঈমান-চর্চার ভিত্তি
১. দৃঢ় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা
রিসালাতের সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবী ﷺ-এর প্রথম ও শেষ দাওয়াত ছিল—
> “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” — একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
তিনি বলেছেন—
> “যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”
— (বুখারি, মুসলিম)
তাওহীদ হলো ঈমানের শেকড়;
শেকড় না থাকলে গাছ দাঁড়াতে পারে না।
২. কুরআনের মাধ্যমে ঈমান নির্মাণ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِ ذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَا دَتْهُمْ اِيْمَا نًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

"মু’মিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"
নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা আছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।
নবী ﷺ সাহাবীদের প্রথমে কুরআনের ঈমানমূলক আয়াত শেখাতেন,
তারপর আমল সম্পর্কিত আয়াত শেখাতেন।
২: নবীজীর ঈমানের বাস্তব চর্চা
১. তাকওয়া — ঈমানের নিরাপত্তা চাদর
রাতের গভীরে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে কাঁদতেন...
সাহাবীরা বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা!”
তিনি বললেন—

> “আমি কি এরপরও তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?”
(বুখারি)
তাকওয়া তাঁকে রাতেও ঘুমোতে দেয়নি
কারণ তিনি ঈমানের পাহারাদার ছিলেন।
২. নামাজের মাধ্যমে ঈমান সজীব রাখা
নবী ﷺ বলেছেন—
> “নামাজ ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী।”
(তিরমিজি)
প্রতিটি নামাজ ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করে।
তিনি জীবনের শেষ সময়েও বলছিলেন—
> “আস-সালাত! আস-সালাত!”
— নামাজ! নামাজ!
৩. জিকির ও দুআ — ঈমানের খাদ্য
তিনি বলেন—
> “তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করো।”
সাহাবীরা জানতে চাইলেন—কিভাবে?
তিনি বললেন—
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি বলো।”
(মুসনাদে আহমদ)
ঈমানের পরীক্ষা ও ধৈর্য
প্রথম যুগে মুশরিকরা সাহাবীদের নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে—
কিন্তু নবী ﷺ তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন:
দৃঢ়তা
ধৈর্য
আল্লাহর সাহায্যের প্রতি পূর্ণ ভরসা
উদাহরণ:
বিলাল (রা.)— আগুনের তাপে পাথর বুকে রেখেও বলতেন—
“আহাদ, আহাদ!”

৪. নবীজীর তাওহীদ শিক্ষা : ঈমানের ভিত্তি

শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত

আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য না চাওয়া

কবরে, তাবিজে, জাদুতে ভরসা না করা

হাদিস:

> “যে মারা যাবে অথচ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি, সে জান্নাতে যাবে।”

(বুখারি)

৫. ভালো চরিত্রের মাধ্যমে ঈমানের পরিপূর্ণতা

সত্যবাদিতা

আমানতদারিতা

নম্রতা

গীবত-পরনিন্দা বর্জন

হাদিস:

> “সর্বোত্তম মুমিন সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।”

(তিরমিজি)

৬: নবী ﷺ এর নীতি—ঈমান রক্ষার সোনালী উপায়

১ পাপ থেকে দূরে থাকা

> “গুনাহ হৃদয়ে অন্ধকার আনে।”

(মুসনদে আহমদ)

২ সৎ ও ঈমানদার সঙ্গ বেছে নেওয়া

> “মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন অনুসরণ করে।”

(তিরমিজি)

৩ নিয়মিত আত্মসমালোচনা

হিসাব নেওয়ার আগে নিজেকে হিসাব দাও।

৪ সৎ কাজের প্রতিযোগিতা

> “: যারা সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, তাদের ঈমান কখনো দুর্বল হয় না।

৭: সার্বিক বিশ্লেষণ

নবী ﷺ ঈমানকে—

ভাবনায় নয়, বাস্তবে
মুহূর্তে নয়, প্রতিক্ষণে
বক্তৃতায় নয়, চরিত্রে
রোপণ করেছেন।
তিনি—
ঈমানকে শিক্ষা দিয়েছেন
ঈমানকে রক্ষা করেছেন
ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন
ঈমানকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন

তাই তিনি ঈমানের সর্বোত্তম শিক্ষক।
যারা নবী ﷺ-এর পথ অনুসরণ করবে— তাদের ঈমান অটুট থাকবে
প্রতিটি ঝড়েও, প্রতিটি পরীক্ষাতেও।
কারণ তিনি রেখে গেছেন— দুটি নিখুঁত নকশা—
আমানত ফলাফল
কুরআন সঠিক দিশা
সুন্নাহ বাস্তব আদর্শ
এ দুটো ধরে রাখলে— ঈমানের মৃত্যু নেই।
এ দুটো ছেড়ে দিলে— ঈমানের জীবন নেই।

নবী মুহাম্মদ ﷺ কেবল একজন নেতা নন—
তিনি একজন ঈমান নির্মাতা,
একজন হৃদয় সংস্কারক,
একজন চরিত্রের স্থপতি

## ১৯.ইসলামী ইতিহাসে ঈমান রক্ষা ও পতনের উদাহরণ

১ ইবরাহীম (আ.) — এক যুগান্ত ভূমিকা: ত্যাগ, তাওহিদ ও পরীক্ষা
প্রেক্ষাপট: ইবরাহীম (আ.) ছিল তাওহিদ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত; তার সমাজে বহু লোক মূর্তিপূজায় বিভোর।

ঘটনা: তিনি সৃষ্টিকর্তার আভাস দিয়ে কুসংস্কার ভাঙার চেষ্টা করেন; কল্পিত দেবতাগুলোর ভাঙচুর করেন; কাওম তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ সেই আগুনকে ঠাণ্ডা ও নিরাপদ করে দেন। পরবর্তীতে তিনি সন্তান ইসমাইলকে আল্লাহর আজ্ঞায় কুরবানি করার প্রস্তুতি নেন — যেখানে ত্যাগের সর্বোচ্চ শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ফলাফল: কাওমের বিরুদ্ধে আল্লাহর বার্তা স্থির হল; ইবরাহীমের চরিত্র অনুকরণীয় হয়ে ওঠে।

শিক্ষণ: তাওহিদের জন্য সম্পূর্ণ ত্যাগ ও নিশ্চিহ্ন আস্থা; ঈমান যেসব সময়ে পরীক্ষা হয়, সেখানে ত্যাগী মনই জিতে যায়।

১৯.২ মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল — নিপীড়ন, মায়াবী মুক্তি ও ঈমানের অস্থিরতা

প্রেক্ষাপট: বনী ইসরাঈল দীর্ঘকাল ফেরাউনের শাসনে অত্যাচারে ভুগছিল। মূসা (আ.) আল্লাহর নবী হিসেবে পাঠিত হন।

ঘটনা: ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আল্লাহর অশেষ মুজিজা; সমুদ্র বিভক্ত হয়ে বনী ইসরাঈল নিরাপদে পার হয়; কিন্তু পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমানের স্থিতি হারিয়ে বাছুর পূজায় নিপতিত হন।

ফলাফল: নির্দিষ্ট একটি জাতির মুক্তি এসে গেলেও, মানবপ্রকৃতি—সাময়িক আল্লাহর দিক মুহূর্তিক দেখলে স্থায়ী না থাকার ঝুঁকি — প্রকাশ পেল।

শিক্ষণ: ঈমান শুধু মিরাকল দেখে স্থায়ী হয় না; ধারাবাহিক ত্রিপক্ষীয় অনুশাসন ও নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন।

১৯.৩ আশহাবে উখদুদ — যোগ্যতা ও নির্যাতনে অবিচলতা

প্রেক্ষাপট: বিজ্ঞ ইতিহাসে বর্ণিত, কিছুমান কট্টরপ্রতিপালক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট বিশ্বাস কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর তাণ্ডব চালায়।

ঘটনা: জনসম্মুখে আগুনে ঢেলে মৃত্যুবরণ করা হয় বিশ্বাসীদের; কিন্তু তাদের মধ্যের অনেকেই দৃঢ় ছিলেন — প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত ঈমান-ধৈর্য প্রদর্শিত হয় (কাহিনীটি খোদ কুরআন ও ঐতিহাসিক সূত্রে নানা রূপে বর্ণিত)।

ফলাফল: শহিদদের কাহিনী পরবর্তী যুগে লোককে অনুপ্রাণিত করে; দুনিয়ার অনাচার ও নির্যাতন হিসেবেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

শিক্ষণ: ঈমান রক্ষায় জীবন উৎসর্গের মহত্ত্ব; অধিকার-সম্মান ও পরকালের প্রত্যাশা।

১৯.৪ মক্কায় প্রাথমিক নির্যাতন — বিলাল, সুমাইয়া ও যাসের ঘরানা

প্রেক্ষাপট: নবীর প্রথম প্রচারযাত্রায় মক্কার নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণি (কুরাইশ মূলত) সম্মুখ প্রতিরোধ স্থাপন করে।

ঘটনা: মুসলমান নবীনগণ (বিশেষত গরিব ও দাস-কন্যারা) ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হন—সুমাইয়া (রা.) প্রথম নারী শহীদ; বিলাল (রা.)-কে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কষ্ট দেওয়া হয়, তবু তিনি লজ্জা না পেয়ে "আহাদ! আহাদ!" জপ করে চললেন; যাসর পরিবারের উপর অত্যাচার ইত্যাদি।

ফলাফল: নির্যাতন মুসলিমদের মধ্যে ধৈর্য, একত্ববোধ ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং পরের সময় তাদের বিজয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষণ: সত্যবাক্য মানে অনেক সময় ব্যক্তিগত কষ্ট; কিন্তু ঈমানের মূল্য বহুগুণ বেশি।

১৯.৫ হিজরত — ইসলামি সমন্বয় ও নতুন জীবনের সূচনা

প্রেক্ষাপট: মক্কার নির্যাতন তীব্র হওয়ায় নবী ও সাহাবা মদিনায় আশ্রয় নেয়—হিজরত হলো ধর্মীয়-সামাজিক পুনর্গঠন।

ঘটনা: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঐক্য; মদিনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয়—মসজিদ, সামাজিক বিধান, দাওয়াহ ও সমবায় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়।

ফলাফল: ইসলাম প্রশাসন, আইন ও সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে বাস্তব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়; উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষণ: বিশ্বাস শুধু আত্মিক নয়—ভৌত বাস্তবতাতেও প্রয়োগ করতে হবে; সমাজ-সংগঠন ঈমানকে টিকিয়ে রাখে।

১৯.৬ বদর যুদ্ধ — সংখ্যার উপর ঈমানের বিজয়

প্রেক্ষাপট: মক্কার শক্তিশালী মদতপুষ্ট বাহিনী বনাম নবী (সা.)-এর অনিল সৈন্যশক্তি; পরিস্থিতি মুমিনদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

ঘটনা: ৩১৩ জন মুসলিম বনাম বিপুলসংখ্যক প্রতিপক্ষ; ধর্মভীরু অনুপ্রেরণা, সূরণ-নিয়ম মেনে যুদ্ধকৌশল ও আল্লাহর সাহায্য—সব মিলিয়ে মুসলিমরা বিজয়ী হয়; বহু কাফির মৃত্যুবরণ করে বা ধরা পড়ে।

ফলাফল: বদরের বিজয় মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও ইমানকে বহুগুণ শক্ত করে; এটি ইসলামের প্রথম বড় সামরিক বিজয় হিসেবে সিম্বলিক।

শিক্ষণ: ঈমান ও আনুগত্য থাকলে সংখ্যায় কমেও বিজয় সম্ভব; আল্লার প্রতি বিশ্বাসই লাইফবোট।

১৯.৭ উহুদ যুদ্ধ — আনুশাস্য ও পরিণতির শিক্ষা

প্রেক্ষাপট: বদরের পর মক্কার প্রতিশোধ নিতান্তই প্রত্যাশিত ছিল; উহুদে বিভাজন ও দলে অনুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

ঘটনা: প্রধানত তীরন্দাজদের (আলোচ্য) পাহারা ভেঙে পড়ায় মুসলিম বাহিনীর অনেক লড়াকু তাদের অবস্থান ত্যাগ করে; ফলে মুমিনেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—উহুদ যুদ্ধ সাময়িকভাবে মুসলিম পক্ষের জন্য ভোগান্তিকর; নবী (সা.) নিজেই আহত হন।

ফলাফল: সাময়িক পরাজয় হলেও মুসলিম সমাজে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও নেতৃত্বের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিক্ষণ: ঈমানের সঙ্গে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য অপরিহার্য; পরিস্থিতি অনুভব করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

১৯.৮ হুদাইবিয়া চুক্তি — কৌশলগত ধৈর্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল

প্রেক্ষাপট: মক্কার দিকে নবী (সা.)-র ইরেদা ছিল—কিন্তু কৌশলগতভাবে মুহূর্তিক সংঘর্ষ এড়ানোই শ্রেয় মনে করা হয়।

ঘটনা: হুদাইবিয়ার বর্ণিত শান্তিচুক্তিতে শর্ত ছিল কড়া; অনেক সাহাবীর মনে প্রথমে এটি কঠিন লেগেছিল; কিন্তু পরে এ চুক্তি ইসলামের প্রসারের পথে সুবিশাল সুফল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

ফলাফল: কয়েক মাস-বছরের মধ্যে বহু বেছে নেওয়া লোক শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করে; চুক্তিটি ইসলামের কৌশলগত জয়ের পথ খুলে দেয়।

শিক্ষণ: আবেগে ভেসে সরাসরি কাজে নেমে না পড়ে কৌশলপূর্ণ ধৈর্যই প্রগাঢ় ফল দেয়; ঈমান মানে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ।

১৯.৯ মক্কা বিজয় — ক্ষমাশীলতা ও নৈতিক নেতৃত্ব

প্রেক্ষাপট: বহু বছর অনুশাসন, উত্থান-পতন শেষে মুসলিম বাহিনী শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছায়।

ঘটনা: মক্কা শান্তিপূর্ণভাবে জয় করে নবী (সা.) ক্ষমাশীলতার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন—প্রচণ্ড শত্রুসমূহকেও ক্ষমা করে দেন এবং পুরনো শত্রুতার শেষ মিটে যায়।

ফলাফল: ঐতিহাসিকভাবে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; মক্কা দুনিয়ার নৈতিক-আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়।

শিক্ষণ: ঈমানের শক্তি ক্ষমাশীলতা ও নৈতিক নেতৃত্বে প্রকাশ পেলে সমাজ বদলে যায়।

১৯.১০ আবু বকর (রা.) ও রিদ্দা যুদ্ধ — ঈমানের নীতিগত রক্ষাকবচ

প্রেক্ষাপট: নবীর পরবর্তী সময়কালে কিছু গোষ্ঠী সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়—এরা দু'ধরনের: (ক) যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা (খ) নতুন প্রতিপালক/মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রচারণা।

ঘটনা: আবু বকর (রা.) কঠোর নীতিতে এগিয়ে এসে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা করেন—এটি কেবল রাজনৈতিকই নয়, ধর্মীয় সঠিক রীতিতে থেকে ঈমান-জাতীয় নীতিকে স্থির করার প্রয়াস ছিল।

ফলাফল: ইসলামী নীতি রক্ষিত হয়; নবীর পরও উম্মাহ একান্তভাবে টিকে থাকে।

শিক্ষণ: ঈমানের মূলনীতিকে রক্ষা করতে কখনো নমনীয় হওয়া যায় না; ন্যায্য কর্তব্য পালনে কড়া দৃষ্টান্ত প্রয়োজন।

**১৯.১১** ওমর (রা.) — ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ঈমানভিত্তিক শাসন

প্রেক্ষাপট: উমর ইবনে খত্তাবকে খিলাফতে বসানো হলে তিনি ন্যায়, হিসাব-নিকাশ ও সামাজিক সুবিচারের উচ্চমান স্থাপন করেন।

ঘটনা: রোম এবং পারসদের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের পাশাপাশি তিনি গৃহস্থালীর লোকেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন—শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহর বিধানকে কেন্দ্র করে রাখার চেষ্টা করেন।

ফলাফল: ইসলামী শাসনের স্বচ্ছতা বেড়ে যায়; অধুনিক আইনি-প্রশাসনিক শৃঙ্খলার আদর্শ স্থাপিত হয়।

শিক্ষণ: ঈমান ও তাকওয়া যদি শাসনে প্রবেশ করে—তবে সমাজে সুস্থতা আসে

**১৯.১২** উসমান (রা.) — কোরআন সংরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ ভাঙন

প্রেক্ষাপট: কুরআন বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কণ্ঠে পাঠের কারণে বিভ্রান্তি দেখা দিলে উসমান (রা.) কোরআনের একক কপি প্রস্তুত করে বিতরণ করার উদ্যোগ নেন।

ঘটনা: তিনি কোরআন সংকলন, মসজিদ নির্মাণ ও উন্নয়ন তহবিলে অনুকরণীয় অবদান রাখেন; কিন্তু কিছু রাজনৈতিক অপচেষ্টার ফলে অভ্যন্তরীণ ফিতনা জন্মায়—শেষ পর্যন্ত উসমান শহীদ হন।

ফলাফল: কোরআন সংরক্ষিত হলেও উম্মাহর মধ্যে বিভাজন শুরু হয়—এটি পরবর্তী অনেক বাধার সূত্রপাট।

শিক্ষণ: জ্ঞান ও ধর্মীয় ধন সংরক্ষণ জরুরি, কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্গতি ও সতর্কতা অপরিহার্য।

**১৯.১৩** আলী (রা.) — মতবিরোধ, খারিজি আন্দোলন ও ঐক্যের সংকট

প্রেক্ষাপট: উসমান হত্যার পর আলী (রা.)-এর খিলাফতকে কেন্দ্র করে গণমানুষের প্রতিক্রিয়া ও মতপার্থক্য তৈরি হয়।

ঘটনা: মহাযুদ্ধ—সিফফিন, খারিজিদের উত্থান—সবই আলী (রা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়; উম্মাহ দ্বিখন্ডিত হতে বসে।

ফলাফল: ঐক্যহীনতা ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করে; রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষণ: মতপার্থক্য থাকলে আলোচনা, সহনশীলতা ও ঐক্য রক্ষার চেষ্টা না করলে ঈমানও ভেঙে যেতে পারে।

১৯.১৪ উমাইয়া সাম্রাজ্য — ক্ষমতা, রাজনীতিক বিশালতা ও নৈতিক দুর্বলতা

প্রেক্ষাপট: উপকেন্দ্রিক রাজনীতি, উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাজবংশীয় ভাবমূর্তি খিলাফাতে প্রবেশ করে।

ঘটনা: তৎকালীন প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামরিক শক্তি থাকলেও, সময়ের সাথে সঙ্গে রাজকীয় বিলাসিতা, অসাম্যের বিস্তার ও ধর্মীয় নেতৃত্বের দূরত্ব বাড়ে।

ফলাফল: সুশাসন বিচ্যুত হলে জনমানসে ধর্মীয় চর্চা অনিন্দ্যস্থ হয়ে পড়ে; ফলে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তৈরি হয়।

শিক্ষণ: রাজনীতি ও ধর্মের সঠিক সঙ্গতি না থাকলে সমাজ দ্রুত অবক্ষয়ে যেতে পারে।

১৯.১৫ আব্বাসীয় স্বর্ণযুগ — জ্ঞানের বিকাশ ও পরে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

প্রেক্ষাপট: আব্বাসীয় যুগে বাগদাদ হয়ে ওঠে জ্ঞান, শিল্প ও গবেষণার কেন্দ্র—হাসানাস-সাবাহ এমন শত পণ্ডিত উঠে আসে।

ঘটনা: দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ও দার্শনিক চিন্তা বিকশিত হয়; কিন্তু রাজকীয় বিলাসিতা ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে পরবর্তীকালে আক্রমণমুখী বাহিনীর মুখে পতন ঘটে।

ফলাফল: জ্ঞানচর্চা বৃহত ছিল—কিন্তু ঐক্যহীনতা ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা চিরকাল ধরে রাখতে ব্যর্থ করে।

শিক্ষণ: জ্ঞান অর্জন ও ঈমান একসাথে থাকা দরকার; যদি জ্ঞান শুধু পার্থিব গৌরবের জন্য হয়, তখনই ভাঙনের শুরুও দেখা যায়।

১৯.১৬ আন্দালুস (সেন্ত্রাল স্পেন) — সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, উজ্জ্বলতা ও পতন

প্রেক্ষাপট: ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা আন্দালুসে প্রবেশ করে একটি দীর্ঘকালীন উজ্জ্বল সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে—কোরডোবা, গ্রানাদা প্রভৃতি শহর জ্ঞানের কেন্দ্র।

ঘটনা: দীর্ঘ সময় সাইন্স, ফিলোসফি, আর্ট ও বহুভাষিক মিলনে সমাজ সমৃদ্ধ হয়; পরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর রিকনকুইস্তার ফলে মুসলিম শাসন পতিত হয়।

ফলাফল: এক যুগের জন্য মানব সভ্যতায় আলোকবর্তিকা হলেও ভাগবাটোয়ারা ও ঐক্যহীনতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের কারণ হলো।

শিক্ষণ: বহুমাত্রিক উন্নতি থাকলেই চলবে না—ঐক্য, সামাজিক নৈতিকতা ও স্থিতিশীলতা থাকতে হবে।

**১৯.১৭ উসমানীয় ও মুঘল যুগ — দীর্ঘায়ু শক্তি ও পরে সংস্কৃতিক পরিবর্তন**

প্রেক্ষাপট: উসমানীয় শক্তি বহু শতাব্দি উন্নত ও সুসংগঠিত শাসন চালায়; মুঘলরা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বিশাল সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করে।

ঘটনা: উভয় সাম্রাজ্যই দীর্ঘকাল বিস্তৃত পরিসরে ইসলামিক আইন ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে; কিন্তু পাশ্চাত্যের চাপ, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আধুনিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাদের ধীরে ধীরে দুর্বল করে তোলে।

ফলাফল: অনেক জায়গায় সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটলেও, আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারায় সাম্রাজ্যগুলি প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

শিক্ষণ: ঐতিহ্য রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ — কিন্তু সময়োপযোগী সংস্কারও অপরিহার্য; ঈমান বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বে সমন্বয় প্রয়োজন।

**১৯.১৮ উপমহাদেশে ঈমান রক্ষা: শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়্যিদ আহমদ ও দারেল উলুমসহ আন্দোলন**

প্রেক্ষাপট: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আগমন ও নতুন শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে।

ঘটনা: শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবন আন্দোলন চালান; পরবর্তীকালে সাইয়্যিদ আহমদ (শাহীদ) যুদ্ধ ও জিহাদী কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন; দারুল উলুম দেওবন্দ মতবাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে তাওহিদ রক্ষা করেন।

ফলাফল: উপমহাদেশে ধর্মীয়-শিক্ষাগত পুনর্জাগরণ ঘটে; মুসলিম সমাজ কিছুটা ঐক্য লাভ করে।

শিক্ষণ: স্থানীয় আলেম ও আন্দোলন ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে; ঈমান রক্ষার জন্য শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য।

**১৯.১৯ সার্বিক বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত শিক্ষা (থিসিস-ভিত্তিক সংকলন)**

ইতিহাস দেখায়—ঈমান রক্ষিত থাকলে সমষ্টিগত উন্নতি; ঈমান দুর্বল হলে পতন।

প্রধান কারণসমূহ: ঐক্যহীনতা, নৈতিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক দুর্বলতা, বিলাসিতা ও বাহ্যিক প্রলোভন।

প্রতিরোধের পথসমূহ: শিক্ষা-প্রসার, আলেম নেতৃত্ব, ঐক্য রক্ষা, নৈতিক উদাহরণ স্থাপন, কুরআন-বিষয়ক পুনরুজ্জীবন।

ছোট কনক্লুশনিমেশন

1. প্রতিটি যুগের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়—ঈমান কিভাবে সমাজকে গড়েছে ও ধ্বংস করেছে।
2. ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকালে কিভাবে সামাজিক-নৈতিক নীতিমালা ও শিক্ষাকৌশল বানানো যায়—এটাই মূল চ্যালেঞ্জ।
3. গবেষণাস্বরূপ প্রস্তাব: প্রতিটি ইতিহাস-অধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট কেসস্টাডি, কুরআনিক-হাদিসীয় রেফারেন্স এবং আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যোগ করলে থিসিস শক্ত হবে।

## ✨ ২০. সচ্চরিত্র সাহাবীদের উদাহরণ

ইসলামের ইতিহাসে রাসুল সাঃ এর সাহাবীরা হলেন ঈমানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁরা শুধু মুখে ঈমানের ঘোষণা দেননি; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে মানবতার সামনে এক আদর্শ রূপ স্থাপন করেছেন। তাঁদের ঈমান, আমল, নৈতিকতা ও ত্যাগ—আজও পুরো মুসলিম উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দেয়।

সাহাবাদের ঈমানের বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পরম ভালোবাসা
২. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিরলস ত্যাগ
৩. শক্ত বিশ্বাস ও বিনয়ী চরিত্র
৪. আমল ও আক্বীদায় দৃঢ়তা
৫. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতমুখী দৃষ্টি

নিচে তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা, চরিত্র ও ত্যাগ থেকে কিছু অনন্য উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

★ (১) হযরত আবু বকর (রাঃ): অটল বিশ্বাসের চূড়ান্ত রূপ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের ঘটনা বললে কাফেররা উপহাস করে তাঁর নিকট গিয়ে বলল:
"তোমার বন্ধু বলে যে, তিনি আকাশে গেছেন!"
তিনি বললেন—

> "রাসূল ﷺ বলেছেন—তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্য!"

এ বিশ্বাসী হৃদয়ই তাঁকে সিদ্দীক উপাধি এনে দেয়।
তাঁর ঈমান ছিল নিঃশর্ত—যুক্তি, সময় বা পরিস্থিতির কোনো অপেক্ষা ছাড়াই।

★ (২) হযরত উমর (রাঃ): ঈমানের কারণে জীবন বদলে যাওয়া

ইসলামের বিরোধী শক্তি থেকে ঈমানের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধায় রূপান্তর—
তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হলো উমর (রাঃ)।

হৃদয়ে ঈমান এলে তাঁর ভিতর সত্য প্রতিষ্ঠার আগুন জ্বলে উঠল। খলিফা হওয়ার পর ঘোষণা করেন:

> "রাত্রে নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও ক্ষুধায় মারা যায়, উমরকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন।"
এটাই হলো ঈমানযুক্ত ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন।

★ (৩) হযরত উসমান (রাঃ): লজ্জাশীলতার মাধ্যমে ঈমান রক্ষা

নবী ﷺ বলেছেন:

> "উসমান (রাঃ)-এর কাছে ফেরেশতারাও লজ্জা করে।"

তিনি তাঁর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন—যেমন "ওসমান কূপ" খনন; যা আজও সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে প্রবাহমান।

★ (৪) হযরত আলী (রাঃ): সাহস, জ্ঞান ও তাওয়াক্কুল

বদরের যুদ্ধ থেকে খাইবার পর্যন্ত তাঁর তলোয়ার ছিল ঈমানের সুরক্ষা-ঢাল।
নবী ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন:

> "আজ আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন; তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।"
খাইবারের দুর্গের দরজা উপড়ে ফেলা তাঁর ঈমানী শক্তির প্রতীক।

★ (৫) বিলাল (রাঃ): নির্যাতনের মাঝেও ঈমানের ধ্বনি – "আহাদ, আহাদ!"

ভূমিতে গরম পাথর, রক্ত ঝরা শরীর—

তবুও জবান কখনো থামেনি।
তাঁর আহ্বান ছিল—
“এক আল্লাহ, এক আল্লাহ!”

এটাই প্রমাণ করে—
যে ঈমান অন্তরে থাকে, অস্ত্র তা নিভাতে পারে না।

★ (৬) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ): ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত

হিজরতের কঠিন রাতে নবী ﷺ–এর গোপন যাত্রায় খাদ্য পৌঁছে দিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর প্রশ্নের মোকাবিলা—
ঈমানি দৃঢ়তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

★ (৭) সুমাইয়া (রাঃ): প্রথম শহীদা—ঈমানের মূল্য রক্ত দিয়ে রক্ষা

শুধু “আল্লাহ এক” বলার অপরাধে নৃশংসভাবে শহীদ হন।
এ মৃত্যু পুরো উম্মাহকে শিক্ষা দেয়—
ঈমানের মূল্য জীবন থেকেও বড়।

★ (৮) খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ): আগুনের উপরেও ঈমানের জয়

ইসলামের শুরুর দিকে কাফেররা তাঁর শরীরে আগুন দিয়ে নির্যাতন করত। পিঠের চামড়া পুড়ে কয়লা হয়ে যেত।
তবুও তাঁর ঈমান না ভাঙে।
তিনি বলতেন:

> “যে দিন আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ হবে—সে দিনের অপেক্ষায় আছি।

★ (৯) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ): হৃদয় ঈমানে অটল

নির্যাতনে বাধ্য হয়ে মুখে কিছু বলতে হলেও তার হৃদয় ছিল ঈমানপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন—
হৃদয়ে দৃঢ় ঈমান থাকলে আল্লাহ ক্ষমা করেন।
এটাই ঈমানের গভীরতার প্রকাশ

★ (১০) খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ): “আল্লাহর তরবারি”

যুদ্ধক্ষেত্রে ঈমান তাকে সিংহের চেয়েও শক্তিশালী করেছে।
জীবনভর যুদ্ধ করেও শহীদ না হওয়ায় বলেছিলেন—

> "কাপুরুষের মতো বিছানায় মৃত্যু আমাকে লজ্জা দেয়।"

এটাই দৃঢ় ঈমানের তৃষ্ণা—শাহাদাত চান

★ (১১) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ): আমানতের সেরা রক্ষক

তিনি ছিলেন "উম্মাহর আমিন"।
বাবা কাফের বাহিনীতে থাকলেও—
দ্বিধাহীনভাবে সত্যের পাশে অবস্থান নেন।

ঈমানের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্কও তিনি ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি
★ (১২) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ): মায়ের চাপেও ঈমান ছাড়েননি

মা বলেছিলেন—
"তুমি ইসলাম ছাড়ো না হলে আমি খাবো না।"
তিনি বললেন—

> "মা! তোমার শত প্রাণ গেলেও আমি ঈমান ছাড়বো না!"

ঈমানের কাছে সব আবেগ পরাজিত
★ (১৩) ত্বালহা (রাঃ) ও যুবাইর (রাঃ): রাসূল ﷺ কে রক্ষা করতে প্রাণ উৎসর্গ

উহুদের যুদ্ধে ত্বালহা (রাঃ) নিজের শরীর দিয়ে নবী ﷺ-কে ঢেকে দেন—
হাতে ৭০টির মতো তীরবিদ্ধ ক্ষত
কিন্তু জবান থেকে অভিযোগ বের হয়নি একটুও।
★ (১৪) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ): ছোট বয়সে বড় ঈমান

১০ বছর বয়সে নবীর খেদমতে আসেন।

কখনো নবী ﷺ তাঁকে ধমকও দেননি।
তিনি সর্বদা সত্যবাদিতা, নম্রতা, সেবামূলক চরিত্রে ঈমানকে জীবনভর বহন করেন।

★ (১৫) আবু দারদা (রাঃ): দুনিয়া থেকে বিমুখ, আখিরাতমুখিতা

তিনি বলতেন—

> "আমার কাছে দুই রাকায়াত নামাজই সারা দুনিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"
ঈমান তাকে সহজ জীবন, কঠিন নৈতিক মূল্যবোধ শিখিয়েছে।

★ (১৬) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ): আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ রূপ

বাইয়াত-ই-আকাবায় বিবিধ বিপদের ঝুঁকি জেনেও তিনি শপথ নেন—

> "আমরা রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করব, যেমন নিজেদের রক্ষা করি।"

ঈমান তাকে সাহসী ও দায়িত্বশীল করে তুলেছে

★ (১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ): জ্ঞানের অক্লান্ত পথিক

ক্ষুধায় পাথর বেঁধে থেকেও হাদিস সংগ্রহ করেছেন।
তিনি বলতেন—
> "দুনিয়া নয়, আমি আখিরাতের ফসল কুড়াই।"
তাঁর ঈমান জ্ঞান প্রচারে অদম্য হয়ে উঠেছে।

(১৮) উম্মে সালামা (রাঃ): Hijrat সহীহ ঈমানের প্রমাণ

প্রথমে সহীহ ঈমানের কারণে পরিবার বিচ্ছিন্ন;
তারপর আল্লাহর পথ ধরে আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরতের ত্যাগ।

তিনি প্রমাণ করেছেন—
ঈমান জীবনের সবকিছুর ওপরে।

সুতরাং,
সাহাবীদের জীবনে আমরা শিখি —

ঈমান শুধু মুখের কথা নয়, জীবনব্যাপী সংগ্রাম।
তাদের নৈতিকতা, ত্যাগ, ধৈর্য, দাওয়াত, ইবাদত—
আজও আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা।
তাদের চরিত্র অনুসরণ করলেই—
ঈমান মজবুত, সমাজ শক্তিশালী, উম্মাহ সফল।

**২১। ব্যক্তি জীবনে ঈমানের প্রভাব**

**ঈমান মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্ত দিককে আলোকিত করে। একজন ঈমানদার তার জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত করে, যা তার ব্যক্তিত্বকে উন্নত, শুদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।**

**.১. অন্তর প্রশান্তি ও মানসিক দৃঢ়তা**

**আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, তাকওয়া এবং আশা—মুমিনের হৃদয়ে শান্তি এনে দেয়।**
**কোনো বিপদ এলেও সে হতাশ হয় না। কারণ জানে**

**> "সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা।"**
**২. নৈতিকতার উন্নয়ন**

**ঈমান মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও বিশ্বস্ততার পথে পরিচালিত করে।**
**অপরদিকে গীবত, মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে।**
**৩. আত্মশুদ্ধি ও পাপবিমুখতা**

**একজন মুমিন সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে, ফলে পাপ করতে ভয় পায়।**
**ঈমান হৃদয়কে পুনরায় পবিত্র করে।**

**৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিক পথনির্দেশ**

**জীবনের প্রতিটি কাজে সে হালাল-হারামের বিচার করে।**
**তার চরিত্রে আখলাকুল কারিমা ফুটে ওঠে।**

৫. ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা

নামাজ, সিয়াম, যাকাত, সাদাকা, কুরআন তিলাওয়াত—এসব তার জীবনের অলঙ্কার হয়ে যায়।

৬.সময়ের সঠিক ব্যবহার

ঈমানদার মানুষ সময়কে আমানত মনে করে। তাই অবসর জীবনও ফলপ্রসূ কাজে ব্যয় করে।

৭.মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাত সচেতনতা

ফলাফল—

আত্মনিয়ন্ত্রণ

দায়িত্বশীলতা

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যনির্ধারণ

৮. মুমিন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা

সত্যবাদিতা  মুমিন কখনই মিথ্যা বলে না
দায়িত্বশীলতা  পরিবার, সমাজ ও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব পালন
সেবামূলক মানসিকতা অভাবী-নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ায়
বিনয়  অহংকার থেকে দূরে থাকে
ইখলাসসব কাজ আল্লাহর জন্য

সুতরাং, ঈমান ব্যক্তিকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলে

২২. যুগোপযোগী উদাহরণ ও বাস্তব জীবনের প্রমাণ

বর্তমান সময়ে ঈমানের শক্তি কিভাবে মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে—এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিরা ও সম্প্রদায়গুলো বিশ্বমানের সফলতার সাথে ঈমানকে সমান্তরালে ধরে রেখেছে।
১. সাহসিকতার বাস্তব উদাহরণ

ফিলিস্তিনের জনগণ শত নির্যাতন সত্ত্বেও ঈমানের দৃঢ়তায় সংগ্রাম করছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস —
বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে ইনশাআল্লাহ।

মৃত্যু আখিরাতে অনন্ত জীবনের দরজা
এই ঈমানই তাদের জীবনের অনুপ্রেরণা।

২. বিজ্ঞান ও গবেষণায় ঈমানের অনুপ্রেরণা
মুসলিম বিজ্ঞানীরা বলেন—
> কুরআন তাদের চিন্তা ও গবেষণার শক্তি দেয়
যেমন:

ড. আবদুল কাদির খান — পাকিস্তানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী
ড. ওমর আবদুল্লাহ — চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদা
তাদের উদ্দেশ্য— মানবতার সেবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
৩.আধুনিক যুগে ধর্মীয় দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধি আন্দোলন

বিশ্বজুড়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করছে ঈমানের যুক্তিগ্রাহ্যতা, শান্তি এবং ন্যায়বিচারের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে।

৪. মিডিয়া, প্রযুক্তি ও দাওয়াহর শক্তি
হাজারো মুসলিম ইউটিউব, টেলিগ্রাম,  ইসলামিক অ্যাপ—এসব মাধ্যমে:

আকীদা শিক্ষা

হিফজ

নৈতিকতা প্রচার
বিশ্বব্যাপী মানুষকে ঈমানের আলোয় ফিরিয়ে আনছে।
৫. যুবসমাজের আত্মপরিবর্তনের গল্প

অনেক তরুণ হারাম জীবন থেকে ফিরে এসে হিজাব, নিয়মিত নামাজ, কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেছে—কারণ অন্তরের ঈমান জেগে উঠেছে।
৬.মানবিক সেবা ও ঈমান

বিভিন্ন দেশে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা—
বন্যা-ভূমিকম্পে উদ্ধারকাজ
এতিম ও গরিবদের সহায়তা
হাসপাতাল/স্কুল প্রতিষ্ঠা
এসব দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন এনেছে।
সারসংক্ষেপ
ক্ষেত্র  প্রমাণ
সংগ্রাম ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, রোহিঙ্গা
জ্ঞান  বিজ্ঞানীরা
নৈতিকতা  যুবসমাজের আত্মশুদ্ধি
দাওয়াহ  প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার
মানবিকতা  সামাজিক সেবায় অবদান
এসব উদাহরণ দেখায়—
ঈমান কোনো কাল্পনিক ধারণা নয়; বরং যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবন্ত শক্তি।

২৪.ইমান দৃঢ় রাখার উপায় ও করণীয়

ঈমান হলো একজন মুসলিমের জীবনের মূল ভিত্তি। ঈমান শক্ত হলে মানুষ সব ধরনের ভয়, লোভ, শয়তানের প্ররোচনা ও নফসের খারাপ প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ইসলাম ঈমানকে দৃঢ় রাখার জন্য বহু নির্দেশনা দিয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমান দৃঢ় রাখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় ও করণীয় নিম্নে তুলে ধরা হলো
১ আল্লাহর প্রতি গভীর معرفة (মারিফাত) অর্জন করা

আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা
আল্লাহর গুণাবলি (আস্মাউল হুসনা) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন
আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে চিনে নেয়া ও ভালোবাসা
যত বেশি আমরা আল্লাহকে জানবো, তত বেশি ঈমান দৃঢ় হবে
২ কুরআনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন

নিয়মিত তিলাওয়াত করা
অর্থসহ বোঝা
এর নির্দেশনা জীবনে প্রয়োগ করা

কুরআন হৃদয়কে জীবন দেয়, ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করে।
৩ নিয়মিত সালাত কায়েম করা
সালাত ঈমানের দৃঢ়তার সর্বশক্তিশালী উপায়
যা মানুষকে অশ্লীলতা ও গোনাহ থেকে বিরত রাখে

> “সালাত অবশ্যই অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আনকাবুত: ৪৫-

৪ ভালো আমল বৃদ্ধি করা

ঈমান ও আমল পরস্পর সম্পর্কিত।
সৎ কাজ করলে ঈমান বাড়ে
গুনাহ করলে ঈমান কমে

তাই নিয়মিত নেক আমল করা জরুরি।
৫ সৎকাজে ধৈর্য ধারণ

জীবনের পরীক্ষাগুলো ঈমানকে আরও শক্তিশালী করে।
ধৈর্য, শোকর ও তাওয়াক্কুল ঈমানের মূল চালিকা শক্তি।
৬ ভালো ও পরিবেশবান্ধব সাথীদের সঙ্গে থাকা

সৎ বন্ধুরা আল্লাহর দিকে আহ্বান করে
বদ সঙ্গ ঈমান ধ্বংস করে
> "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে..." – সহিহ হাদিস
৭ গুনাহের পথ পরিহার

দৃষ্টির হিফাজত
জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ
হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা
গুনাহ হৃদয়কে কালো করে দেয় এবং ঈমান দুর্বল করে
৮ দোয়া ও ইস্তেগফার বৃদ্ধি

দোয়া ঈমান রক্ষার শক্তিশালী অস্ত্র
ইস্তেগফার গুনাহ মুছে দেয়
অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে

নবী ﷺ প্রতিদিন ৭০ বারের বেশি ইস্তেগফার করতেন।
৯ ইসলামী জ্ঞান অর্জন

যে যত বেশি দ্বীনি জ্ঞান রাখে, সে তত বেশি ঈমান রক্ষা করতে পারে।
আলিমদের সান্নিধ্য ঈমানের বরকত বাড়ায়।
10 মৃত্যু ও পরকালের কথা অধিক স্মরণ
কবর
হিসাব

জান্নাত ও জাহান্নাম
এসব হৃদয়ে ভয় ও আশা তৈরি করে, ফলে ঈমান শক্ত হয়।
ঈমান একটি জীবন্ত বীজের মতো; যত যত্ন করা হবে, ততই ফল দেবে।
ঈমান স্থির ও চিরস্থায়ী রাখতে হলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শুদ্ধ আমল, ভালো সঙ্গ, নিয়মিত ইবাদত—এসবকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে।
শয়তান ও নফসের প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে সবসময় আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।
❁ বিশেষ দোয়া

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
“হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখো।”

২৫.গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ

গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, ঈমান মানুষের জীবন ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন অধ্যায় ও ক্ষেত্র অনুসারে গবেষণা থেকে আমরা কিছু মূল ফলাফল নির্ধারণ করতে পেরেছি। এই ফলাফলগুলো আমাদেরকে দেখায় যে ঈমান কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, এটি নৈতিকতা, সামাজিক আচরণ, পারিবারিক দায়িত্ব ও আত্মিক উন্নতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

প্রথমত, গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য নির্দেশ করে যে, যেসব মানুষ নিয়মিত কোরআন পাঠ, সালাত, দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে ঈমান চর্চা করে, তারা নৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি স্থিতিশীল। তারা মিথ্যা, চুরি, অন্যায় ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে যারা দৈনন্দিন জীবনে ঈমানের চর্চা কম বা শূন্য, তারা সামাজিক, নৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়। এটি প্রমাণ করে যে ঈমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক অপরিসীম এবং প্রকৃত ঈমান হলে তা অবশ্যই ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রে প্রতিফলিত হয়।

দ্বিতীয়ত, গবেষণায় দেখা গেছে যে সমাজে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ যেমন আধুনিক প্রযুক্তি, বস্তুবাদী মনোভাব, নাস্তিকতা এবং অশ্লীল মাধ্যমের প্রভাব মানুষের ঈমানকে দুর্বল করতে পারে। কিন্তু যেসব মানুষ পরিবার, শিক্ষক ও সমাজ থেকে দ্বীনি শিক্ষা পেয়েছে, তারা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে সঠিক শিক্ষার সঙ্গে ঈমানের দৃঢ়তা সংযুক্ত এবং শিক্ষার মাধ্যমে ঈমানের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, গবেষণা দেখিয়েছে যে নবীজী (সাঃ) ও সাহাবীদের জীবন থেকে নেওয়া উদাহরণসমূহ আজকের যুগেও ঈমান দৃঢ় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবীদের দৃঢ় ঈমান ও নৈতিক চর্চা সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ন্যায়পরায়ণ, সত্যান্বেষী ও আল্লাহর পথে স্থির ছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম যদি এই উদাহরণগুলো অনুসরণ করে, তবে ঈমানের দৃঢ়তা অটুট রাখা সম্ভব।

চতুর্থত, গবেষণায় উঠে এসেছে যে ঈমান ভঙ্গের প্রধান কারণ হলো কুফরি, শিরক, বড় গুনাহ, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ এবং দাওয়াত-তালিমের অভাব। অনুশীলনে দেখা গেছে যে যারা নিয়মিত ঈমানচর্চা করে, তারা এই প্রলোভন ও প্ররোচনার কাছে প্রতিরোধশীল। এটি নির্দেশ করে যে ঈমান রক্ষার জন্য পদ্ধতিগত ইবাদত, নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সুন্নাহর অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, পারিবারিক কাঠামো ও অভ্যাসও ঈমানের স্থায়ীত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিতা-মাতার সঠিক দৃষ্টান্ত, নৈতিক শিক্ষা, দোয়া ও তাওয়াবান্দির পরিবেশ সন্তানদের ঈমান দৃঢ় করতে সহায়ক। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, যেসব পরিবারে ঈমান ও নৈতিক চর্চা অনুকূল পরিবেশে পরিচালিত হয়, সেই পরিবারের সন্তানরা সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় হয়ে বেড়ে ওঠে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ঈমানের দৃঢ়তা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়; এটি পারিবারিক দায়িত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আচরণ, আইন ও শৃঙ্খলা, এবং সমাজে শান্তি ও সমন্বয় রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী। এছাড়া, যেসব মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে ঈমানকে অগ্রাধিকার দেন, তারা মানসিক শান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি সক্ষম। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে ঈমান শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে ঈমান দৃঢ় রাখা একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কেবল বিশ্বাসের উপর নয়, বরং নিয়মিত ইবাদত, নৈতিক চর্চা, সামাজিক দায়িত্ব, পরিবার ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। এটি নির্দেশ করে যে ঈমান দৃঢ় রাখার জন্য সুসংগঠিত জীবন, সঠিক দৃষ্টান্ত, দোয়া এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা অপরিহার্য। এই ফলাফল

আমাদেরকে শেখায় যে একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানের স্থায়ীত্ব রক্ষা করা সম্ভব এবং এটি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে নয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ।
২৬.উপসংহার: জীবনে ঈমানের স্থায়ীত্ব ও শিক্ষণীয় দিক

ঈমান মানুষের জীবনের মূলভিত্তি। একজন মুমিনের সকল পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈমান। ঈমানই মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচরণ, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং আখিরাতের সফলতাকে নির্ধারণ করে। এই থিসিসের আলোচনা থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে ঈমানই এমন এক শক্তি যা মুমিন বান্দার অন্তরে আলোর উৎস হিসেবে কাজ করে। দুনিয়ার চলার পথে যত চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন, ঈমান সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মধ্যে মুমিনকে সাহসী করে তোলে। ঈমানের দৃঢ়তা যত বেশি, মানুষ আল্লাহর প্রতি তত বেশি অবিচল থাকে এবং সৎকর্মের প্রতি তত বেশি মনোযোগী হয়।

মানুষ দুনিয়ায় বিভিন্ন কৃতিত্ব অর্জন করলেও ঈমান ছাড়া সেই অর্জনের কোনো চূড়ান্ত মূল্য নেই। কারণ ঈমান হল সেই অমূল্য সম্পদ যা আল্লাহর নিকট মানুষকে সম্মানিত করে। তার কোনো বিকল্প নেই, সমতুল্য নেই এবং পরিবর্তনও নেই। ঈমান এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাস যা মানুষের জীবনে সঠিক পথের নির্দেশনা প্রদান করে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্যে পরিচালিত করে। ঈমানই মানুষকে জান্নাতের পথে চলার শক্তি দেয় এবং নরকের আগুন থেকে রক্ষা করে। তাই একজন মুমিনের কাছে ঈমান রক্ষা করা জীবনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব।

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সত্যিকারের ঈমান মানুষের অন্তরের এমন একটি আমানত যা বাহ্যিক আমলে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ঈমান যদি বৃক্ষ হয়, তবে আমল হলো সেই বৃক্ষের ফল। যদি কোনো ফল জন্ম না নেয় তবে সেই বৃক্ষ যেমন মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনি আমলহীন ঈমানও দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আল্লাহ ও তার রাসূল যে আমলের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করাই ঈমানের প্রমাণ। একজন মুমিন যত বেশি নেক আমল করে, তার ঈমান তত বেশি শক্তিশালী হয়। আর মানুষ যখন গুনাহর পথে চলতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তার ঈমান দুর্বল হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাই প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানকে নতুন করে জীবিত রাখার সংগ্রাম।

ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অবনতি উভয়ের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ঈমান। যখন মুসলমানরা ঈমানের ওপর দৃঢ় ছিল, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিল এবং দুনিয়ার লোভ-লাভকে ঈমানের সামনে নগণ্য গণ্য করেছিল, তখন

তারা পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু যখন ঈমানের স্থলে অহংকার, ভোগবিলাস, শঙ্খলাপনা ও দ্বীনের প্রতি অবহেলা স্থান দখল করেছে, তখন মুসলিমরা অপমানিত হয়েছে এবং তাদের ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং ঈমান রক্ষার সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও বটে।

বর্তমান যুগে ঈমানের ওপর নানা ধরনের আক্রমণ চলছে। প্রযুক্তির নাম ভাঙ্গিয়ে, স্বাধীনতার নামে, আধুনিকতার আবরণে মানুষকে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা চলছে। নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, বৈশ্বিক সংস্কৃতি, অশ্লীলতা, বস্তুবাদী জীবনদর্শন—সবকিছু মানুষের মনে ঈমানের শেকড়কে কেটে ফেলতে চায়। এমন এক সময়ে ঈমানকে টিকিয়ে রাখা একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় জিহাদ। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্বীনি নীতিমালা অনুসারে গড়ে না তুললে নতুন প্রজন্ম ঈমানের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই ঈমান রক্ষার দায়িত্ব হলো প্রতিটি অভিভাবক, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রতিটি সমাজনেতা এবং প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির সম্মিলিত দায়িত্ব।

ঈমান এক অবস্থায় থাকা কোনো নিত্য স্থির ব্যাপার নয়। ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। তাই নিয়মিত নিজের ঈমান পরীক্ষা করা জরুরি। তাওবা, যিকির, দুআ, কুরআন তিলাওয়াত, সুন্নাহ চর্চা, হালাল-হারামের প্রতি সতর্কতা—এসব মুমিনের ঈমান নবায়ন করে, জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট করে এবং মৃত্যুর পর নাজাত লাভের পথ নির্মাণ করে। একজন মুমিন যদি প্রতিদিনের জীবনে ঈমানকে প্রথমে রাখার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ তাকে এমন সমৃদ্ধ ও প্রশান্ত জীবন দান করেন যার তুলনা দুনিয়ার কোনো সম্পদ দিতে পারে না।

পরিবারের মধ্যে ঈমানের চর্চা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবারের হাতেই সন্তানদের প্রথম শিক্ষা। সন্তানদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দিতে হলে বাবা-মাকে আগে নিজেদের ঈমান ও আমলের শক্তিশালী উদাহরণ হতে হবে। যদি পরিবারে ঈমানি পরিবেশ থাকে, তবে সমাজে নৈতিকতা বিকশিত হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কল্যাণমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়ে। আর ঈমানহীন সমাজ ভোগবাদে নিমগ্ন হয়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

এই গবেষণা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, ঈমান হলো জীবনের প্রাণশক্তি এবং তার স্থায়ীত্বের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আল্লাহর উপর নির্ভরতা, রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ, শরীয়তের বিধান পালন—এসবই ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে এগিয়ে দেয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের মোহে যদি মানুষ ঈমান হারিয়ে ফেলে, তবে সে প্রকৃত জীবনেই ব্যর্থ। ঈমানই হলো সেই মূলধন যা মানুষকে দুনিয়ায় সম্মান ও আখিরাতে মুক্তি এনে দেয়।

এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, মৃত্যু আমাদের জন্য নিশ্চিত বাস্তবতা। দুনিয়ায় আমরা যতদিন জীবিত থাকি, ঈমান রক্ষা করা এবং তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ঈমানের শক্তিই আমাদের দুনিয়ার সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাহস দেয়। তাই ঈমানকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে মূল্যায়ন করা এবং একে রক্ষা করা হলো প্রতিটি মুমিনের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব।

আল্লাহ যেন আমাদের ঈমানকে দৃঢ় রাখেন এবং মৃত্যুর সময় ঈমানের সঙ্গে কবুল করেন—এটাই সর্বোচ্চ কামনা। কারণ শেষ নিঃশ্বাসে যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটাই সফলতার চূড়ান্ত গন্তব্য। ঈমানের আলোয় আলোকিত জীবনের জন্য আমরা যেন সর্বদা সচেষ্ট হই, এটাই এই গবেষণার সর্বোচ্চ শিক্ষা এবং চূড়ান্ত উপসংহার।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيْمَانِ

হে আল্লাহ! আমাদের ঈমানের উপর দৃঢ় রাখুন। আমীন।